মাঝারি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা—৪

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ, ১৩৬০

প্রকাশক
শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী
দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা—৪

মুদ্রাকর
বি, এন, ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণ
দি স্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা।

বাঁধাই
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৬১।১, মির্জাপুর স্ট্রীট্,
কলিকাতা।

দাম—দু'টাকা আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ—

অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই, পি, এস্

অশেষ স্নেহাস্পদেষু

নিবেদন

এ বই বারোটি রসপ্রবন্ধের সমষ্টি। আর কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এই সঙ্গে দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাতে কলেবর-বৃদ্ধি হয়ে যায় এবং তাদের রসও আলাদা। প্রকাশক রম্য রচনায় উৎসাহী এবং ঈষৎ লঘু সুরের পক্ষপাতী। তিনিই বইয়ের নামকরণ করেছেন আর রচনাগুলি নির্বাচন করেছেন বিনয় ঘোষ ওরফে ‘কালপেঁচা’।

রস-সাহিত্যের চর্চায় যাঁরা আমায় এ যাবৎ উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, ডাঃ সুকুমার সেন, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, কবি অজিত দত্ত ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বালিগঞ্জ

১লা বৈশাখ, ১৩৬০

গ্রন্থকার

মাঝারি

মাঝারি কথাটা এতই মাঝারি যে ওর ঠিক্ মানেটা বলা শুধু শক্ত নয়, একুটু লজ্জার ব্যাপারও বটে। 'অর্থাৎ', 'মানে', 'বুঝলেন কিনা', 'ঠিক্ তা নয়, তবে কাছাকাছি', 'ঐ হলো আর কি' প্রভৃতি কয়েকটা প্রতিশব্দ ব্যবহার ক'রে নিজেই গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় জেরার মুখে। তখন লজ্জায় অধোবদন হয়ে ভাবতে হয়—কেন মরতে ও কথাটা মুখ দিয়ে বের করেছিলুম। কিন্তু অন্য কি কথাই বা বলতেন, যখন একদিকে শ্রুতিমধুর মিথ্যা আর অপরদিকে অপ্রিয় সত্য? মেয়ে দেখে এসে বাড়ীতে রিপোর্ট দিয়েছেন কখনো?

সত্য-মিথ্যার কথা ছেড়ে দিই, কেন না অনেক ক্ষেত্রে হয়তো নীরবতা অবলম্বন ক'রে যে কোনও জবাবই এড়ানো যায়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে জেরা বা জবাবের বিড়ম্বনা নেই, শুধুই একটা নির্দোষ মত-প্রকাশ, সেখানে ওই মাঝারি কথাটা ছাড়া আর দ্বিতীয় বাক্য নেই যেটা ঠিক মাঝারির অর্থ বহন করিতে পারে। উঁচু-নীচু, বড়-ছোট, ভালো-মন্দ প্রভৃতি গুণাত্মক শব্দগুলো যেন এক ধনুকের দু'টি বিপরীত কোটি। এদের মধ্যবর্তী স্তরের ব্যাখ্যায় অথবা বর্ণনায় অভিধানে ঐ একটি কথাই আছে। বড় জোর একটু শুদ্ধ ক'রে 'মধ্যম' প্রতিশব্দটি ব্যাবহার করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ দুম্ ক'রে একটা সংস্কৃত-ঘেঁষা বাক্যের ব্যবহার শুনলে

আপনার বন্ধুরা সেটা রসিকতা বলে ভ্রম করতে পারেন আর প্রতিপক্ষ ভাবতে পারেন, কথাটির মধ্যে মারাত্মক শ্লেষ আছে।

ব্যবহারিক জগতে, সাংসারিক অভিজ্ঞতায় মানুষ এই শিক্ষাই পায়—যে কোনো ব্যাপারে আতিশয্যটা অনুচিত, যে কোন বিষয়ে, আচরণে, মত-প্রকাশে, চলন-বলনে বাড়াবাড়িটা ভালো নয়। সব জিনিসের মাঝারিটাই ভালো। অতি উঁচু ঘরে বিয়ে দেওয়া অথবা বিয়ে করাটা সুখের বা স্বস্তির হয় না। আবার তেমনি নীচু ঘরে কাজ করাটাও বনিবনার পক্ষে অশুভ। শুধু যে দাম্পত্য জীবনেই এদের প্রতিক্রিয়াটা ভোগ করতে হয়, তা নয়। বৈবাহিক সম্পর্কে যত লোক আছেন, তাঁরাও অকারণে মাথা ঘামিয়ে কষ্ট পেতে থাকেন এবং ভুলটা কোন্‌খানে হয়েছিল সেটার প্রত্যক্ষ কারণ বার করেন পদমর্য্যাদার অসামঞ্জস্যে।

অতি বাড় বেড়ে যারা অধঃপতিত হয়েছিলেন প্রবাদ বাক্যেই সে সব মহাপুরুষের তালিকা পাওয়া যায়। আবার অতি বিনয়ে নীচু হওয়ার দরুণ ছাগলে মুড়িয়ে খাওয়ার কথাটাও অবিদিত নয়। বড় মাছটা দেখতেই ভালো কিন্তু খেতে তেমন নয়। আবার চারা পোনার গায়ে যে কাঁটা, তাতে খাওয়ার সুখ চলে যায়। অতি চতুর বালক-বালিকাদের আমরা ডেঁপো বলে থাকি, আবার অতি মাত্রায় নীরব ও নিরীহ প্রাণীদের আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখিনা। যিনি অতি বড় ঘরণী, তিনি ঘর পান না আর যিনি অতি বড় সুন্দরী তিনিও বর পান

না, এগুলো নিতান্তই প্রবাদ-বাক্যের অতিশয়োক্তি নয়। আমাদের দেশে যত বচন, যত উপদেশ, তার সবগুলোই প্রায় মাঝারি-র জয় কীর্তন ও গুণগান করেছে।

প্রকৃতপক্ষে মাঝারি জিনিসটা মোটেই মাঝারি নয়। মানুষের স্বভাবের ঝুঁকৃতিটা দু'টো পাল্লার মতন স্থিরমধ্য নয়, এদিক ওদিক করবেই। নিক্তির কাঁটা যেমন সাধ্য-সাধনায় নিশ্চল ক'রে আনতে হয়, তেমনি ভালো-মন্দ নানা সূক্ষ্ম দোলার স্তরগুলো পেরিয়ে মাঝারির ভার-কেন্দ্রে এসে পৌঁছানো যায়। কাজেই ওর একটি বিশেষ মূল্য আছে। একটা উদাহরণ দিলেই জিনিসটা পরিষ্কার হয়। আমি ও আমার পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তিই একটু বেশি কথা বলে থাকি এবং বেশি কথা বলার যেগুলো আনুষঙ্গিক বিপদ সেগুলো হামেশাই ভোগ করি। তবু জেনে-শুনেও বাক্‌পটু লোকদেরই পছন্দ করি বেশি। ফলে যাঁরা কথা বলেন নিতান্তই কম, সারা দিনে দুটো কি চারটে, তাঁদের প্রতি আমাদের আসক্তি তো কমই, এমন কি অনুকম্পার ভাব। কিন্তু যাঁরা দরকার মত ওজন ক'রে, পরিমাণ মাফিক কথা বলেন, যাঁদের স্থৈর্য অটল, অপর পক্ষের প্রচুর উৎসাহ ও তর্কপ্রিয়তা এবং অখণ্ড অবসর থাকা সত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলেন না, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের অসীম।

যে কোনো বস্তু, পদার্থ, প্রাণীর মধ্য অবস্থা ও রূপটাই আমাদের ভালো লাগে। মাঝারি বয়েসটা শৈশব আর বার্ধক্যের মাঝখানে, তাই এতে দু'পক্ষের দোষগুলো কম।

শক্তি, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যের মিশ্রণটা জোরালো রকমের পরিস্ফুট। আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলগুলোর কথা একবার ভেবে দেখুন। অপক্ক অবস্থায় হিতকারী কবিরাজি ওষুধে চলতে পারে বটে, কিন্তু রসনাগ্রে বেশি অম্ল অথবা কষায়। আবার অতি-পক্ক হয়ে গেলে রসালুতার চেয়ে ঝাঁঝটাই লাগে বেশি। এ অবস্থায় দরকার মত ডাঁসা ও মাঝারি পাকা জিনিসেরই আমরা খোঁজ ক'রে থাকি। গৃহপালিত পশুপক্ষীর বাচ্ছাগুলো দিন কয়েক আমাদের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র আর বুড়ো হলে তো বাতিল হয়েই যায়। কিন্তু মাঝারি বয়েসের অর্থাৎ পূর্ণ যৌবনের দাম আমরা তাদের দিয়ে থাকি। বেশি ঘুণ ও ঝুনো মেয়েকে কেই বা পছন্দ করে বলুন? আর বুড়ী মেয়েদের খুকিপনাও আপনার সহিষ্ণুতাকে অতিমাত্রায় পীড়িত করবে। এ অবস্থায়, সপ্রতিভ মাঝারি গোছের একটি পটীয়সী মহিলা মাঝখান থেকে অনায়াসেই আপনার চিত্তহরণ ক'রে নিয়ে যেতে পারেন।

আবার এই গুণবান্ মাঝারির রূপ ও অর্থান্তর ঘটে, ঘটনা এবং অবস্থার বৈষম্যে। আমাদের বাঙালীর যৌথ পরিবারের মতন বৃহৎ গোষ্ঠীর আজব চিড়িয়াখানার কথাটা একবার ভেবে দেখুন। সেই পরিবেশে 'মধ্যম' ব্যক্তিটির অস্তিত্ব বিশেষ অর্থ-সূচক। পল্লীর ও পরিবারের যিনি মধ্যম-স্থানীয়, তাঁর প্রতিপত্তি হয় তো বেশি। কিন্তু অনেক সময়ে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ মধ্যস্থতায় পাঁচ জন উপকৃত হলেও, আড়ালে তাঁর গুণপনাকে আমরা 'মোড়লী' বলেই থাকি। বাংলাদেশে

এমন কোন গ্রাম বা পাড়া নেই যেখানে খুড়ো, দা'ঠাকুর নেই। আবার এমন সংসারও খুবই কম যেখানে কোনো মামা, পিশে, মেশো স্বেচ্ছায় এবং বিনা কমিশনে বহু ঝামেলা সহ্য না করেন। প্রয়োজনে, বিশেষ ক'রে সঙ্কটে, এ সব লোকের ডাক পড়ে। তখন বিনা বাক্যব্যয়ে এঁদের নির্দেশ মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু অগোচরে এমন সব বিশেষণ মধ্যে-মধ্যে প্রয়োগ করা হয় এই মধ্যস্থতার বিরুদ্ধে, যে শুনলে মনে হয় জগতে নিমক্‌হারামির জয়।

তবে মধ্যমের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হয়, তার কিছুটা ন্যায্য কারণও আছে। বাড়ির যিনি মধ্যম তাঁর মন বোঝা মনস্তাত্বিকের এলাকা। ব্যপারটা একটু গোল-মেলে। এর মধ্যে একদিকে আছে একটু অনাদর, অপরদিকে আছে নিরুদ্ধ মনের বক্রগতি। যৌথ পরিবারে যিনি মেজ ভাই তাঁর অস্তিত্বটা দাপটের নয়, ঝাপটের। অর্থাৎ যিনি বাড়ীর জ্যেষ্ঠ, তিনি প্রথম সন্তান হিসেবে যে আদর, যত্ন, ভালবাসা, নজর ও স্নেহদৃষ্টি ভোগ ক'রে নেন, তার কিছুই জোটেনা মেজ'র কপালে। আবার যিনি ছোট, অর্থাৎ কোলের ছেলে তিনি সাধারণ বাঙালী বাড়ীতে চল্লিশ বছরেও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, দায়িত্বহীন খোকা থেকে যান। বৎসরান্তে এক একটি সন্তানের পিতা হয়েও তাঁর কোনও দুশ্চিন্তাই নেই। বাবা না থাকুন—মাথার ওপরে দাদারা আছেন এবং দাদারা শুধু থেকেই সুচারুরূপে কনিষ্ঠের মস্তক চর্বণ ক'রে দেন। অতএব বড়র কাছে বকুনি খেলে মেজকে শুনতে হয়, 'দাদা যদি

মেরেই থাকে রাগের মাথায়, তাতে হয়েছে কি? হাজার হোক্ বড় ভাই তো!' এদিকে ছোট যদি আবদারের মাথায় মেজ'র কপালে ইঁট ছোঁড়েন, তাহ'লেও মেজকে শুনতে হয়, 'চুপ্! চুপ্! ছোটভাইএর কতো আব্দার সহ্য করতে হয়, বড় হলে! কাঁদতে আছে কি! লোকে নিন্দে করবে যে!' তাই মেজ'র অদৃষ্টে আঁকা রইল সহিষ্ণুতার জয়টীকা, তার আদর্শ হ'ল লাঞ্ছিত ভরত। রাজ্যভোগ তার কপালে নেই। নেই বড়র সম্মান, নেই ছোটর আদর। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ক্রমাগত ঝুলতে থাকার ফলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়াটা প্রকাশ পায় পরবর্তী জীবনে, যখন মেজ হয় সংসারী। বঞ্চিত ভাগ্যের প্রতিশোধ মেলে সাংসারিক সুযোগে, যার ফলে সে ক্রমশঃ সাংসারিক, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল হতে শেখে!

হাইকোর্টে যত মামলার শুনানি হয়, তার নথি-পত্র ঘাঁটলে আমার বিশ্বাস, দেখা যাবে যে বাদী হল বাড়ীর মেজ ভাই। ছেলেবেলা থেকে যে শীতল ও উদাস ব্যবহার পেয়ে আসে, তার চরিত্রে তার কিছুটা প্রতিফলন হবেই। সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যদি শেষ বয়সে বড় ও ছোটর চেয়ে মেজ'র সম্পত্তিটাই বড় ও দামী হয়। শিক্ষাদীক্ষায় কিংবা অন্য গুণপনায় বড় ও ছোটর সমকক্ষ না হলেও মেজর বুদ্ধি এবং সাংসারিক জ্ঞান একটু কূট ও জটিল হয়। মেজ'র চরিত্রের এই দিকটা তার স্ত্রীর চরিত্রেও কিছু পরিমাণ ছাপ ফেলে। স্বামীর মতন সেও খানিকটা চাপা স্বভাবের এবং হয়তো একটু কুঁজড়ো হয়ে পড়ে সংসারের তীব্র চাপে। এক দিকে

বাড়ীতে বড় বৌ, সর্বময়ী কর্ত্রী,—অপর দিকে বাড়ীর ছোট বৌ, দায়িত্ব-হীনতায় এবং সাজসজ্জায় মনোহারিণী,—এ দু'জনের মাঝে পড়ে মেজ বৌ হয় কোণঠাসা এবং সেই কোণ থেকেই সে পৃথিবীকে বিচার ও গ্রহণ করতে শেখে। দৃষ্টির পরিধিটা তাই অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আর সংসারের ওপর সেই দৃষ্টিটা একটু অসরল তির্যক্ রেখায় ঘুরতে থাকে। মেজ বৌরা আসলে লোক খারাপ হয় না। আচারে ব্যবহারে, কর্মপটুতায় লৌকিকতায়, আমি মেজ বৌদেরই তারিফ করি। বড়র পদ না পেয়েও অনেকটা বড়র দায়িত্ব নিতে হয় তাকে, স্বামীর মতই। শাশুড়ীর সিন্দুকের গয়নার অধিকাংশটা যায় বড় ও ছোট বৌয়ের কাছে। মৃত শ্বশুরের ঘড়ির চেনটা হয়তো কেবল তার ভাগে পড়ে। বড় বৌয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে যে ধুম-ধাম, মেজ বৌয়ের ছেলের বেলায় হয়তো তার সিকিও হয় না। ছোট বৌয়ের ভগ্নীপতির ভাইপোর আইবুড়ো ভাতে যে তত্ত্ব যায়, তার অর্ধেকও যায় না মেজ বৌয়ের একমাত্র বোনের বিয়েতে। তাই মেজ বৌয়ের মনটা যদি থম্‌থমে হয়ে থাকে, তার দৃষ্টিটা একটু সতর্ক এবং সন্দিহান হয়, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। অতএব, সংসারে যাঁরা মাঝারি, বৃহৎ পরিবারে যাঁরা মধ্যম, তাঁদের অবস্থাটা বিশেষ সুবিধের নয়। গড়পড়তা হিসেবেই আমার এ মন্তব্য, নইলে ব্যতিক্রমও আছে বৈ কি!

বাড়ীর মেজ ভাই এবং বৌয়ের দল আমার ওপর চটছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁদের মনের শান্তির জন্য এটুকু বলতে

পারি যে, মেজদি লোকটিও তাঁদের চেয়ে বিশেষ ভাল নন্।

বড় বোনের যদি সকাল-সকাল বিয়ে হয়ে যায়, তখন মেজ বোনের পোয়া বারো। আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারের কথা ভেবেই লিখছি। হয়তো চারটি বোন। বড়টির বিয়ে হয়ে গেলেই মেজ বোনের তখন কর্ত্তৃত্ব সুরু হয়। সুবিধে পেলে ভায়েদেরও সে দাপটে রাখতে পারে। বড় বোনের শ্বশুরালয়ে যাবার পর বাপ-মা একটু বিচ্ছেদ-কাতর থাকেন। তাই মেজটি আবার বড় হয়ে উঠছে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং অজানিতে অনেকখানি স্নেহ তাকে দিয়ে ফেলেন, পূর্বে যেটা সে পায়নি। যদি বাপের মন জুগিয়ে চলার আর্ট সে শিখে ফেলে আর মাকে কাজে সাহায্য করে, ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করে, ঝি-চাকর ভালভাবে খাটিয়ে নিয়ে মাকে দিবা-নিদ্রা অথবা উপন্যাস পাঠের একটু সুযোগ দেয়, তাহ'লে আমাদের বলবার কি আছে? এর ওপর যদি সে একটু গৌরবর্ণা ও পয়মন্ত মেয়ে হয়, তাহ'লে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু তার মনেও গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়, যখন তার বিয়ে হয়। তখন বড় ভগ্নীপতির সঙ্গে আপন স্বামীর, বড় বোনের ঐশ্বর্য ও শ্বশুর বাড়ীর পদ-মর্য্যাদার সঙ্গে নিজের শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থার তুলনা চলে মনে-মনে। বড়দির বিয়েতে বাপ-মা যা-যা দান-সামগ্রী এবং যত ভরি সোনার যৌতুক দিয়েছেন, তার চেয়ে কিছু-কিছু কম হয়ে গেলে মেজ বোনের হয় মন-ভারি। এবং প্রথম

যৌবনের সেই মন-ভারি আর ঈর্ষ্যা-মিশ্রিত কৌতূহল বড় সহজে যায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেজদির দল হাস্য-কৌতুকে গৃহ-কর্মে মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয় হলেও কেমন যেন একটু অবুঝ, স্বার্থপর এবং বক্রোক্তি-নিপুণ। শিবনাথ শাস্ত্রী আর শরৎচন্দ্র মেজ বৌ আর মেজদির সুখ্যাতি ক'রে যতই হৃদয়-গ্রাহী উপন্যাস লিখুন না কেন, আমরা কিন্তু ঐ রকম একটি মেজ বৌ অথবা মেজদির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলে চরিতার্থ হই।

সংসারে যাঁরা মাঝের, তাঁদের নিয়ে যথেষ্ট পরচর্চা করা গেল। কিন্তু মধ্যম হয়েও যাঁদের প্রতিষ্ঠা অটল, তাঁদের কথা এবারে বলতে হয়। রামায়ণে ভরতের কথা আর মহা-ভারতে মধ্যম পাণ্ডবের কীর্তি তো বিশ্ব-বিশ্রুত। বিস্তারিত উল্লেখ এ স্থলে অনাবশ্যক। এঁরা মধ্যম হলেও নিতান্ত মাঝারি নন্। শৌর্যে বীর্যে চরিত্রবত্তায় এঁরা চিরকালেরই আদর্শ হয়ে আছেন। দেব-দেবীর কথা যদি স্মরণ করেন তাহ'লে দেখবেন, সেখানেও মধ্যমের জয়। ব্রহ্মা তো সৃষ্টি ক'রে দিয়েই ক্ষান্ত আর মহেশ্বরের ডাক পড়ে বিপদে, রুদ্র লীলার প্রয়োজনে। কিন্তু বিষ্ণুকে পরিশ্রম করতে হয় অক্লান্ত, বাড়ীর মেজ ভাইয়ের মতই। তিনি যে দেবপুরীতে মধ্যম। স্থিতিশীল সাংসারিক ব্যক্তি, পালন-পটু। কমলা আর ক্ষীরোদকেই তাঁর রুচি। প্রয়োজন মত ব্রহ্মাকে স্তব করেন আবার বিপদে নীলকণ্ঠকেও তোয়াজ করেন। বৃহৎ নারী-সংসার, অনেক রকমের কারবার। তাই তাকিয়ার প্রয়োজন এবং লখিয়ার। দায়িত্বের তুলনায় মেজাজ অস্বাভাবিক

রকমের ঠাণ্ডা, অল্পে তুষ্ট না হলেও মন মোটের উপর ভালোই। যে কোনো ক্রিয়া-কলাপই হোক, আগে তাঁর পূজার আয়োজন। মধ্যম দেবতার কার্যকরী মধ্যস্থতায় সকল হিন্দুই আস্থাবান। তা ছাড়া, আমাদের শাস্ত্রে কেন, খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রেও মধ্যমের স্থান উচ্চে। 'হোলি ট্রিনিটি'র মধ্যে 'গড দী স্যন'-এর সঙ্গেই খৃষ্টানদের নিত্য-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ, তাঁর জয়গানেই ধর্মপুস্তক মুখর। আর বৌদ্ধ ধর্মমতে মঝ্ঝিম নিকায়, মঝ্ঝিম পথ কি প্রশস্ত নয়?

সংসারে, কর্ম-ক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জগতে এত বেশি উদাহরণ ছড়িয়ে আছে যে মধ্যম অথবা মাঝারির গুণপনা বলতে গেলে আর শেষ হবে না! রাষ্ট্র-জীবনেই বলুন আর সমাজ-জীবনেই বলুন, চরমপন্থী বা উগ্রপন্থীর চেয়ে সুবিধাবাদী মধ্য-পন্থী দলের সমাদরই বেশি। বিপদে-আপদে সরকারকে এঁরা রক্ষা করেন। বিদ্রোহে-বিপ্লবে এঁরাই ঘটকতার কাজ করেন। মধ্যবিত্তদের যতই 'বুর্জোয়া' বলে উপহাস করিনা কেন, তাঁরা নগণ্য নন। স্বার্থপরায়ণ হলেও দেশের সমাজ-চিন্তায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের দান কেউই কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা যদি তোলেন, দেখবেন সেখানেও মধ্যমের আসন সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ দু'দিকে যুদ্ধ-রত দেশ, এ স্থলে মধ্যস্থ দেশের অবস্থা আরামদায়ক না হলেও তার মধ্যস্থতা উভয় পক্ষেরই কাম্য। তার হ'ল মাঝের শক্তি, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতই প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য। কৌটিল্যও অর্থশাস্ত্রে 'মণ্ডল' বর্ণনায় অরি, মিত্র, বিজিগীষু, উদাসীন

প্রভৃতি নানা পক্ষের মাঝখান থেকে মধ্যমকেই উচ্চ পদ দিয়েছেন। ভূলোক আর স্বর্লোকের মধ্যবর্তী স্থানও যে বর্তমান জগতে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বায়ুযান আর বায়ু-যুদ্ধের যুগে সে কথা আর বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

তারপর ধরুন ইতিহাসের কথা। সামাজিক শ্রেণী-বিভাগে মধ্য-বিত্তের যে স্থান, ঐতিহাসিক যুগ-নির্ণয়ে মধ্যযুগের সেই স্থান। সভ্যতার প্রদোষকাল এবং অন্ধকার যুগ অতিক্রম ক'রে এসেছে ঐশ্বর্য-মণ্ডিত মধ্যযুগ। জরাজীর্ণ প্রাচীনের আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক বর্তমানের মধ্যে স্বর্ণ-সেতু রচনা করেছে মধ্যযুগ। তার গুণও যেমনি, দোষও তেমনি। তবু এই প্রশস্ত যুগের সুবর্ণ মুহূর্তগুলির জন্যে বহু আধুনিক কবি সাহিত্যিকই আফশোষ করেছেন। এই মধ্যযুগের রোমান্স ও ধর্মপ্রীতির মোহে পড়েই তো বেলক্, চেস্টারটন ও এলিয়ট আধুনিক বিচারে অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন। সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি সত্ত্বেও এই যুগেই ছিল যৌথ ও সমবেত শ্রেণী-প্রচেষ্টার মত প্রগতিশীল বিপ্লবী বীজ—নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সার্থকতায় পরিণত হতে চলেছে। ইতিহাসকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, মানুষের ধর্ম, শিল্প ও সমাজচিন্তায় মাঝারি যুগ হল মধ্যযুগ, পরিণতিকামী। নানা কারণে তার উদ্দেশ্য, আদর্শ বাধা পেয়েছিল কিন্তু একটা যে মস্ত আলোড়ন হয়েছিল মধ্যযুগে, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

দেখা যাচ্ছে—সর্বত্রই মধ্যম অথবা মাঝারির একটা বিশিষ্ট, গণ্যমান্য আসন আছে। ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডী থেকে সুরু ক'রে,

সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক পরিবেশ পর্যন্ত মধ্যমের এলাকা ছড়িয়ে গেছে। শিক্ষার এবং বৈজ্ঞানিক জগতেও 'মীডিয়ম' অথবা মাধ্যমের স্থান স্বীকৃত আর এমন কি অচেনা, আধ্যাত্মিক জগতেও মধ্যস্তর, মধ্যলোক নির্দিষ্ট করা আছে। তাই কোনো যুগেই কোন ব্যাপারেই মধ্যমের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উড়িয়ে দেওয়া যায়নি এবং যাবে না। রেল গাড়ীর ইণ্টার ক্লাশের মতই পদে পদে এর অন্তরঙ্গতা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রথম অথবা জ্যেষ্ঠের গম্ভীর আভিজাত্য হয়তো তার নেই, যেখানে ছুরি-কাঁটা সাব্-সেলাম চলে। আবার কনিষ্ঠ বা তৃতীয় শ্রেণীর নিরাভরণ ইতরতাও তার নেই। এর সান্নিধ্য হ'ল নিবিড় ও নিরুচ্চার, সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে। গদীর আরামও আছে কিছুটা, আবার তক্তা ও লোহার পেরেকের আভাসও আছে। মোট কথা, মধ্যম হ'ল আরামে-অসুবিধায়, ভালোয়-মন্দয় মাঝারি।

একটা কেবল খট্‌কা লাগে মনে। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে মাঝেরটির সার্থকতা কোথায়? অঙ্গুষ্ঠের চতুরতা, তর্জনীর সঙ্কেত, অনামিকার অঙ্গীকার কিংবা কনিষ্ঠার আশীর্বাদ, কিছুই নেই মধ্যমার। আমার বোধ হয়, নির্বোধের চোখে খোঁচা দেবার জন্যেই মাঝের আঙ্গুলের জন্ম। কিন্তু আমার বিনীত উপদেশ—বেশি মধ্যস্থতা করতে গিয়ে স্থূল-চর্ম ঘন-মস্তিষ্ক ব্যক্তির কাছে যাবেন না। ওতে অধম অধমই থাকবে, মাঝখান থেকে আপনারই হবে উত্তম-মধ্যম।

বড়বাবু

সভ্য জগতে বড়বাবুর আসনখানি এতো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে যে ওতে আর ভুলের অবসর নেই। সে আসনের মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুদিন সমাজ স্বীকার ক'রে নিয়েছে। যে কোনো দেশের কথা-সাহিত্য খুললেই বুঝতে পারবেন, সাধারণ মানুষ বড়কর্তাকে কী চোখে দেখে থাকে। উন্মুখ কৃপার্থীর ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তাঁর পদমর্যাদা দ্বিগুণ মূল্য অর্জন করেছে। অতএব, ঘরের অথবা গ্রামের বড়কর্তাই হোন অথবা অফিসে, শিক্ষায়তনে কিংবা অন্য কোনো কর্ম-প্রতিষ্ঠানে তিনি কর্তৃত্ব করুন, তাঁর কর্তৃত্বকে সকলেই সমীহ করে। তাঁর যোগ্যতা নিয়ে অগোচরে যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলুক, সামনা-সামনি সমালোচনা যে ধৃষ্টতা নয়, অমার্জনীয় অপরাধ এবং ক্ষেত্রে বিশেষে তা শাস্তিরই অগ্রদূত, এ কথা অধীনস্থ ব্যক্তিমাত্রই মনে-প্রাণে জানে। ওপর-ওয়ালার প্রতি যে কোনো মনোভাব অন্তরে পোষা থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাশ্যে অথবা ইঙ্গিতে সেটি ব্যক্ত করলে ফলাফলের আশঙ্কায় সকলেই সন্ত্রস্ত বোধ করে। তাই, কি ঘরে কি বাইরে—বড়কর্তাকে এমন একটা অতিরঞ্জিত প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষটিকে সহজভাবে চেনবার পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক দাঁড়ায়। সমাজের এই কৃত্রিম মূল্যদান কিন্তু এক হিসেবে অনেক ক্ষতি করেছে। ওপর-ওয়ালার সঙ্গে নিম্নপদস্থ লোকদের সম্পর্কটা

শুধুই আড়ষ্ট, অসরল এবং কুণ্ঠিত হয়ে ওঠেনি, ক্ষতিটা হয়েছে তারও বেশি। একদিকে এসেছে স্বার্থ-সমস্যা, কূটচিন্তা এবং বুর্জোয়া ধর্ম। অপর পক্ষে মানুষের চরিত্র তার সহজ স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে হয়েছে ক্লিষ্ট, খিন্ন, চাটুকারিতায় আর মিথ্যাচরণে জটিল এবং অনিষ্টকর।

আমরা, যারা বাঙালী সংসারের জীব এবং বাঙালী সমাজ ও কর্ম-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাস ক'রে উদরান্নের সংস্থান করি—আমরা ভালোভাবেই জানি বড়বাবুর মাহাত্ম্য। তিনি উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ এবং সদাশয় না হয়েও অধীনস্থ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, যাঁর সাম্‌নে তীব্রতম অপমানের প্রতিবাদে শুধু মাথা নীচু ক'রে নীরবে হজম করাটাই বিচক্ষণতার পরিচয়—যাঁর মনস্তুষ্টিতে চাই অক্লান্ত নিষ্ঠা, যাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুতম হাসির রেখাটি আমাদের পঁচাত্তর টাকার ভাগ্যগগনকে বৃদ্ধি-আশায় রঞ্জিত ক'রে দেয়, যাঁর কান ভারী হলে টেবিল-চেয়ারগুলো পর্যন্ত গাম্ভীর্যে থম্‌থমে হয়ে ওঠে, আবার যাঁর কান পাতলা হলে আগামী দিনের নিশ্চিন্ততাটুকু আসন্ন প্রলয়ের মূর্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—যাঁর সংসারের ভৃত্যের ও কুশলপ্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বর্গত পিতৃগণ তৃপ্ত ও ধন্য হন।

এই আপাত-নিরীহ কিন্তু কার্যতঃ অসীম প্রতাপশালী বড়বাবুর প্রতি আমাদের যে ভয়-ভাবনা-মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গী, সেটা বহুদিন ধরে গড়ে উঠেছে। বাঙালীর শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কার যেমন ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে অনেকখানি তৈরী হয়েছে, তেমনি বড়বাবু নামক ব্যক্তিটিরও এক সামাজিক

অভিব্যক্তি আছে। এইখানে তাঁর কুলজী নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রায় দু'শো বছর হল ইংরেজ এদেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে কাজ-কর্ম, কথাবার্তা চালানোর চেষ্টায় বাঙালীই প্রথম এগিয়ে এসেছে এবং ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছে। ১৭৫৬ সালে যে সংস্পর্শের সূত্রপাত, তাই ধরে এল ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বিদেশী ব্যবসায়ের কল্যাণে তারি দ্রুত উন্নতি হতে লাগল এবং উনিশ শতকের শেষ অর্ধে তারি প্রসার এবং পূর্ণ বিকাশ হল। এই দু'শো বছর ব্যাপী সংস্রবের ফলে বাংলার সমাজ-গঠনের যে কয়েকটি অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন দেখা দিল, বড়বাবু তাদেরই অন্যতম। আমাদের সে যুগের সমাজপতি-কর্তার দল নিশ্চয়ই দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন, তাই চটপট ইংরেজী পড়তে ও শিখতে লেগে গেলেন; শাসক-সম্প্রদায়ের ভাষাশিক্ষা যে আখেরে ভালো কাজ দেবে, সে চৈতন্য তাঁদের ছিল। উপরন্তু তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে রাজভাষার পাশে বঙ্গভাষা কেমন যেন মেরুদণ্ডহীন। ওতে আছে 'নিবেদন', 'বিনীত', 'সেবক', 'যে আজ্ঞে', প্রভৃতি কতকগুলো নিস্তেজ কথার থোলো-থোলো মাংস। নেই এতোটুকু হাড়ের জোর, যার ফলে মেজাজ একটু উগ্র হয়ে জবরদস্ত গরম বুলির প্রেরণা জোগায়। তাই কাজ-চালানো ইংরেজী শিক্ষা জরুরী হয়ে পড়ল এবং বেনিয়ান ও মুচ্ছুদ্দির দল ইংরেজী-বাঙলার ইডিয়ম-মিশ্রিত একটি নিজস্ব অপরূপ ভাষায় কাজ চালিয়ে নিতে লাগলেন।

এই মুচ্ছুদি-বেনিয়ান এ দেশে কোম্পানির আমলের এক নতুন সৃষ্টি। এঁরা না থাকলে এ জায়গায় ইংরেজের সওদাগরী চলত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তখনকার দিনে বড় বড় ব্যাঙ্কও ছিল না, দেশী মহাজনরাও ইংরেজের সঙ্গে কারবারে বেশি টাকা ঢালতে ভরসা পেত না। ভাবত, পিঠে কোট, মাথায় হ্যাট্ চাপিয়ে জাহাজে চড়লেই সব ফরসা। তাই ভরসা-স্থল হলেন এই সব মুচ্ছুদ্দির দল—যাঁরা হতেন ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী। তাঁরা সাহেবদের হয়ে জামিন থাকতেন, প্রয়োজন মত অর্থও বার করতেন, সাহেবদেক প্রয়োজনীয় চালানী মালের খবরদারী করতেন, এক একটি ছোট খাটো দপ্তরের কর্তা হয়ে বসতেন এবং আপনাদের কমিশন বাবদ ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতেন। কলকাতার এবং শহরতলীর বহু ধনী বংশের পূর্বপুরুষেরা এই মুচ্ছুদ্দিগিরি ক'রে বিস্তর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে গেছেন। আমদানি বিলাতী মাল এঁরাই বাজারে কাটাতেন এবং দেশী ব্যাপারীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যে অনেক সময়েই এঁরা ইংরেজ বণিকদের 'গ্যারান্টি' থাকতেন। ব্যবসা-সম্পর্কে আদান-প্রদান ক্ষেত্রে এই বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দির দলই কুঠী-অফিসের তত্ত্বাবধান করতেন। ব্যবসার ক্ষেত্র যখন বিস্তৃত হয়ে বিদেশী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করল, তখন রাজনীতি ও অর্থনীতি একত্র হয়ে সরকারী ও সওদাগরী দপ্তরখানার সৃষ্টি করল। সেকালের কুঠীর বড়বাবুই আজ-কালকার বড়বাবুর প্রথম সংস্করণ। সেই হিসেবে বাঙলার জমিদারবর্গের মতই বর্তমান বড়বাবুরাও

ইঙ্গ-বঙ্গ ঐতিহ্যের দাবি করতে পারেন। সেকালের বেনিয়ান বাবুরা ইংরেজি সওদাগরি হাউসে কাজ ক'রে যে অর্থ ও কৃতিত্ব আয়ত্ত করেছিলেন, তা কম নয়। সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে, পূজা-পার্বণে, দাতব্য কাজে অর্থব্যয় ক'রে এবং বহু আত্মীয়-পোষ্য প্রতিপালন ক'রেও তাঁরা যে সম্পত্তি ক'রে গেছেন, তাঁদের বংশধরগণ তিন চার পুরুষ ধরে আজও তার উপস্বত্ব ভোগ করছেন।

এঁদের ঠিক পরেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে। উনিশ শতকের শেষভাগে সরকারী অফিস ছাড়া বহু সওদাগরি ও বেসরকারী অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই সব দপ্তরে যে সব এনট্রান্স ও এফ-এ পাশ করা অথবা বি-এ ফেল্-করা ভদ্রসন্তান কাজ করতেন, তাঁদের কাজ অধিকাংশই জুটিয়ে দিতেন বড়বাবুরা। কালক্রমে তাঁরাই আবার বড়কর্তা হয়ে বসতেন। এঁদের বেশীর ভাগ বাস করতেন কলকাতারই কাছাকাছি গঙ্গার তীরে বসত-বাড়ীতে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বড়বাবুরা কুঠীর পানসি চড়ে কলকাতায় অফিস করতে আসতেন এবং শত কালবৈশাখী অগ্রাহ্য ক'রে আবার ঠিক সন্ধ্যায় সদলবলে বাড়ী ফিরে যেতেন। এঁদের হাতের কলমই ছিল হাতিয়ার। ইংরেজের দেওয়া কলম শহরের সঙ্গে এদের দক্ষিণ হস্তের যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু নাড়ীর যোগটা অক্ষুণ্ণ ছিল বাস্তুভিটার সঙ্গে। এই যুগের নাগরিক সভ্যতা ও সামাজিক প্রতিবেশের কিছুটা ছবি পাওয়া যাবে বাঙলার

গোড়ার দিক্‌কার গদ্য-সাহিত্যে—টেকচাঁদ ঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে দীনবন্ধু মিত্রের রচনায়, আর উনিশ শতকের শেষভাগের সামাজিক পরিচয় খানিকটা পাওয়া যাবে রস-সাহিত্যিক অমৃত বসু এবং কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখায়।

বড়বাবুর চরিত্র-চিত্রণ অথবা নক্সার কিছু প্রয়োজন আছে কি? তাঁর ধরণে ও আচরণে যে সব ছোটখাটো অসঙ্গতি আছে, তা নিয়ে জীবনে ও সাহিত্যে অনেক হাস্যবিদ্রূপই করা হয়েছে। মানুষমাত্রেরই দোষগুণ থাকে। যিনি অফিসের কিংবা কোন দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কর্তা-ব্যক্তি, তাঁরও নিশ্চয়ই আছে। কারণ, তিনিও আপনার আমার মতই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ,—সুখে-দুঃখে, ব্যক্তিগত স্বার্থে, উদারতায়, সরলতায় ও কূটবুদ্ধিতে, ক্ষমায় ও কর্তৃত্বের অদম্য স্পৃহায় নিতান্তই মানুষ। সামান্য কেরানিকুল অথবা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাছে তিনি অ-সাধারণ, যেহেতু তাদের ভাগ্য-বিধাতা তিনিই। শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলেই সকলের প্রখর দৃষ্টি পড়ে তাঁরই ওপরে, আড়ালে ও ইঙ্গিতে তাঁকে নিয়ে যথেষ্টই সমালোচনা চলে। তাঁর কদম-ছাঁটা চুল, ভারী চিবুক, তীক্ষ্ণ ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, খাড়া কান ও ঝোলা গোঁফ, পাকানো চাদর, ঝক্‌ঝকে টিফিনের বাক্স এবং পানের কৌটা—এ সবই সুপরিচিত অতিচিত্রিত সত্য দৃশ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভাবা উচিত, যে ভদ্রলোকেরও পিছ্‌টান আছে, সংসার আছে, আছে তারই আনুষঙ্গিক অশান্তি ও সমস্যা এবং ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত পরিবারের ভদ্রতা-রক্ষার প্রাণান্ত বিড়ম্বনা। হয়তো অফিসের মূর্তিটাই তাঁর প্রকৃত পরিচয়

নয়,—হয়তো তাঁর জীবনে কোন বিশেষ ট্র্যাজেডি প্রচ্ছন্ন আছে। এমনও কি হতে পারে না যে, একদা বিহ্বল যৌবন-দিনে তিনিও আপনার আমার চেয়েও উজ্জ্বলতর স্বপ্ন দেখেছিলেন, গভীরতর প্রেমে পড়েছিলেন ?) সামাজিক বাধা তখনকার দিনে প্রবলতর ছিল বলেই তাঁর প্রণয়-কামনা সফল হতে পারে নি ? সে যুগে মাসিক পত্রিকা কম এবং গদ্যকবিতা অচল ছিল বলেই প্রাণের অব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন নি এবং অবশেষে অসময়ে পিতৃদায়গ্রস্ত হয়ে সুবৃহৎ সংসারের প্রচণ্ড দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ? হয়তো সুবিধা সুযোগ পেলে তিনিও শ্বশুরের পয়সায় বিলেত পাড়ি দিতে পারতেন ! কিন্তু তা হয়নি। মাসিমার সুপারিশে মফস্বলের সম্পূর্ণই অনাধুনিক কোনো এক ইতিহাস-বর্জিত সাধারণ মেয়ের পাণিগ্রহণ ক'রে জীবনটাকে হয়তো তিনি নষ্ট করেছেন। পরবর্তী কালে ঘরে সন্তান-বহুলা সহধর্মিণীর দাপটে অর্ধমৃত ক্রীতদাসের মতো জীবন কাটিয়ে তাঁর মেজাজ হয়েছে রুক্ষ ও অপ্রসন্ন এবং সেই নিরুদ্ধ মনের কিছুটা প্রতিক্রিয়া পড়ছে অধীনস্থ কর্মচারীদের ওপর।

ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে, আধুনিক যুগে চোস্ত বুলি, দুরস্ত কেতা ও নির্ভুল পোষাক নিয়ে যে সব 'বস্' নিজেই 'কার' হাঁকিয়ে অফিসে আসেন, তিনি যতই সম্ভ্রমের পাত্র হোন্, যতই স্মার্ট ও কর্মপটু হোন না কেন, আমার সহানুভূতির ঝোঁকটা কিন্তু সেকালের সেই বড়বাবুদের উপরই। অফিস ও কর্মজগৎকে এঁরা গ্রহণ করতেন বৃহত্তর গোষ্ঠী বা পরিবার

হিসেবে,—যেখানে দায়িত্ব প্রচুর, অশান্তির অপ্রতুল নেই কিন্তু যেখানে দয়া-মায়ার অবসর আছে, আছে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার অবকাশ। আজকালকার হালফ্যাশনের বড়বাবুর হাসিটা যেমন মোলায়েম, পাইপ ধরার ভঙ্গীটা যেমন তির্যক্, টাইয়ের গ্রন্থিটা যেমন নিখুঁত, কলমের খোঁচাটাও তেমনি মারাত্মক রকমের সূক্ষ্ম।

তবে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সব বড়বাবুদেরই চরিত্রে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটা কেউই পছন্দ করেন না, প্রতিবাদ বরদাস্ত করা ধাতে নেই, নির্ভরশীল স্বল্পবুদ্ধি নিরীহ লোকদের ওপরই তাঁদের আস্থা বেশি। যদি বড়বাবুর নেক্‌নজরে পড়তে চান, তাহ'লে নীরবে কাজ ক'রে যাবেন, অযথা স্মার্টনেস দেখাবেন না, পা টিপ্‌তে বসে গা টিপ্‌বেন না, বুঝে-সুঝে নিজের কথা পাড়বেন,—কিন্তু ভুলেও 'এসোসিয়েশ্যন' কিংবা 'ইউনিয়নের' উল্লেখ করবেন না।

দরাদরি

ছোট বয়স থেকেই শুনে আসছি রূপকথার গল্প—"এক যে ছিল রাজা, আর তার বন্ধু সওদাগর।" রাজা করেন রাজ্য শাসন আর মৃগয়া, কিন্তু সওদাগর ময়ূরপঙ্খী সপ্তডিঙা সাজিয়ে বেরোন বানিজ্য করতে। দেশ-বিদেশ ঘুরে কত ধনদৌলত সংগ্রহ ক'রে ফেরেন দেশে। আরো একটু বড় হলুম—শুনলুম "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।" শিখলুম—ব্যবসাতেই সম্পদ, শ্রী আর প্রতিষ্ঠা। কাজেই সওদা জিনিসটা মনের মধ্যে গেঁথে আছে। আর আজকের দিনে বৈশ্য যুগে বণিক্-সভ্যতার যখন জয়-জয়কার, তখন কারবারী মনোভাব যে আমাদের কায়েমি হয়ে বসবে, এতে বিচিত্র কিছু নেই। এক জোড়া ডিম কেনা থেকে সুরু ক'রে রাজনৈতিক কূট চাল পর্যন্ত সর্বত্রই এই দর-কষাকষি। শাক-সবজি আর মাছের বাজারের হট্টগোলটা অবিশ্যি কেউ পছন্দ করেন না। কিন্তু তিন টাকা সেরের জিনিস ন' সিকেয় সওদা ক'রে ক্রেতা পরিতৃপ্ত মনেই বাড়ী ফেরেন এবং আর পাঁচ জনকে ডেকে শোনান। তেমনি আবার বাদ-বিতণ্ডা, দলাদলির উত্তেজনা অপ্রীতিকর হলেও বহু নেতাই আপন আপন দাবি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। প্রজারা রাজার কাছ থেকে আর রাজা প্রজা-দের কাছ থেকে যে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের সর্ত আদায় ক'রে নিয়েছেন, ইতিহাসের পাতায় তার প্রচুর সাক্ষ্য মিলবে।

বাস্তবিক পক্ষে, এই দর-কষাকষি আর দাঁও বাগানো কোথায় নেই বলুন ? নিজেদের দেশ আর সমাজের কথাটাই আগে ভাবি। আমাদের কর্মে, চিন্তায়, সামাজিক আচরণে কি নিত্যই ফুটে ওঠে না এই কারবারী মনোভাব ? শ্রমিক-কৃষকের যেটুকু স্বার্থবুদ্ধি. তার শত গুণ হ'ল আমাদের। তাদের দরাদরিটা হাটে আর মাঠে, আমাদের বেসাতি বুদ্ধিটা সর্বত্রই। শিক্ষায় আর রুচিতে আমরা অবিশ্যি আরো উন্নত, মার্জিত। কিন্তু কতটুকু কম পেলুম, কি উপায়ে আরো একটু সুবিধা ক'রে নেওয়া যায়, সেই চিন্তাটাই কি আমাদের চলনে-বলনে ধরা পড়ে না ? সমস্ত ক্ষণই যেন আমরা ভাবছি—"ঠকে গেলুম, ও লোকটা জিতে গেল !" এই থেকেই আসছে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ঈর্ষ্যা। ছোট ভাই ভাবছে বড়কে কি ক'রে ফাঁসান যায়। বড় ভাই ভাবছে ছোটকে কি ক'রে ভাসানো যায়। মেয়ের বাপ ভাবছেন কত কমে বেহাই পাওয়া যায়। ছেলেব বাপ ভাবছেন কৌশলে আরেকটু দাবির মাত্রা বাড়িয়ে নেওয়া যায় না ? এই চুক্তি আব মধ্যস্থতা আমাদের ধাতে যেন বসে গেছে। মাঝখান থেকে, ঘটক আর দালাল উভয় পক্ষেব মাঝে পড়ে বেশ দু'পয়সা হাতিয়ে নেয়। বিশ্বব্যাপী যখন ঘটকতা আর দালালি, তখন তার পারিশ্রমিক দিতে হবে বৈ কি ! কখনো সেটা "ডীল," কখনো সেটা "আঁতাত," কখনো বা "প্যাক্ট।" মোটের মাথায়, সর্বত্রই জাগ্রত রয়েছে একটি হুঁসিয়াব কারবারী মন। কাজটা সফল হলে নিজের কোলে ঝোলটুকু টেনে নিয়ে তবে আমরা নিশ্চিন্ত। আস্ত-

জাতিক ক্ষেত্রে কিংবা রাজনৈতিক দরবারে যিনি যত কূটনীতি-বিশারদ, তাঁর সম্মান ততই বেশি। কিন্তু বোধ হয়, সব সময়ে নয়। দাবার চালে সিদ্ধহস্ত, পাকা খেলোয়াড়ও অনেক সময়ে ভুল ক'রে ফেলেন। তাই "বারগেন" করতে বসে অতি সূক্ষ্ম চালও বান্‌চাল হয়ে যায়। তখন আর আফশোষের অন্ত থাকে না। অতি বুদ্ধির এই শোচনীয় ব্যর্থতা সাধারণের কাছে উপভোগ্য এবং কৌতুককর।

একটা চল্‌তি কথা আছে—ঝোপ বুঝে কোপ মারো। কাজটি কিন্তু খুব সোজা নয়। এ কাজে পটু তাঁরাই, যাঁরা মানব-চরিত্র বোঝেন এবং সেই মত কাজ করেন। মনে করুন, আপনি ব্যবসায় নামতে চান, কিন্তু মূলধন আপনার নেই। এ অবস্থায় আপনি কি করবেন? কোনো পুঁজি-ওলা মহাজন ধরবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কাজের বেলায় দেখবেন, তাঁকে কাজে নামানোই একটা সমস্যা। যাঁরা পাকা ব্যবসাদার, তাঁরা লাভ-লোকসান খতিয়ে না দেখে, মার্কেটের অবস্থা না বুঝে ঝপ ক'রে টাকাটা আটকাতে নারাজ। যদি বা রাজি হন, নিজের স্বার্থটা ষোল আনা বজায় রেখে, যাতে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে সেই ভাবে তিনি অগ্রসর হবেন। তখন আপনাকেও হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে তাঁর মনস্তুষ্টি ক'রে। যাতে তিনি বিগ্‌ড়ে না যান, তার জন্যে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তবে সেই সুযোগে হাল না ছেড়ে যদি নিজের স্বত্বটা পাকাপাকি ক'রে নিতে পারেন, নিদেন পক্ষে পার্সেন্টেজটা বাড়িয়ে নিতে পারেন, তাহ'লে সেটা আপনারই

কৃতিত্ব। নইলে আর একজন এসে আপনার জায়গা দখল ক'রে নেবে।

দরাদরি করতে কে না চায় ? দরিদ্র কৃষক থেকে সম্পন্ন গৃহস্থ সকলেই এ কাজ নিত্য ক'রে থাকেন এবং ভালোবাসেন। গাঁয়ের ছিদাম মণ্ডল হাটে গিয়ে যদি দু'টো লাউ-কুমড়ো সস্তায় সওদা করে, তাহ'লে তার যে আনন্দ আর কলকাতার মহাজন বড়-বাজারে মাল গস্ত করতে গিয়ে পাইকারি দরটা যদি দু'চার আনা কম করাতে পারেন, তাহ'লে তাঁর আনন্দটাও ঐ একই জাতের। বড় কন্‌ট্রাক্টর সাহেব-সুবোর পিছনে ঘোরাঘুরি আর তদ্বির ক'রে যখন চার-পাঁচ লাখ টাকার কাজ পান, তখন তাঁর যে মনোভাব আর শ্যামপুকুরের বাঁড়ুজ্যে মশাই হাতিবাগানে গিয়ে যখন দৈনিক বাজারের অতিরিক্ত সরেস মর্তমান কলা ও পেঁপে সস্তায় কেনেন, তখন তাঁর একই মনোভাব।

আপনারা সকলেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, বাজার করায় এবং সস্তায় সওদা করার মধ্যে একটি বিশেষ আনন্দ আছে, যা আর কোথাও মিলবে না। বাজার-দরের চেয়ে কিছু কমে কপি আর ভেটকি মাছ কিনে বাঙালী গৃহস্থ বাড়ী ফেরেন দিগ্বিজয়ী হাসি নিয়ে। অনেক গৃহস্থই দেখেছি, কাছের বাজার ছেড়ে এক মাইল দূরের বাজারে ছোটেন ভালো জিনিস সস্তা পাবার আশায়! আমার নিজের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে দুঃখময়। সুপুরি-মশলা আর লোহার কড়া বড়বাজারে সুবিধা দরে পাওয়া যায়, এই শুনে একদা আমি ঐ অঞ্চলে গিয়ে যে

দাম দিয়ে এসেছিলুম, তার বিস্তারিত উল্লেখ আমাকে এখনও শুনতে হচ্ছে। তবে যারা অভিজ্ঞ সাংসারিক ব্যক্তি, তাঁরা জানেন কোথায়, কি ভাবে এবং কখন্ কি দরে জিনিস পাওয়া যায়। তাঁদের মুখে যখন লোহাপটি, আলুপটি, পোস্তা, রাধাবাজারের সূক্ষ্ম সংবাদ শুনতে পাই, তখন তো আমার রীতিমত সম্ভ্রম বোধ হয়। ক্ষুদ্র মানুষ এক জীবনে কতটুকুই বা শেখে এবং কাজ করে, এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করি।

ফেরিওয়ালার কাছে জিনিস সওদা করা—সেও একটা নেশা। দোকানে-বাজারে যে আবহাওয়া, বাড়ীর দেউড়িতে তার চেয়ে বেশি আরাম ও অন্তরঙ্গতা। ফেরিওলাকে ডেকে তার সঙ্গে হু'টো বাজে কথা বলে সস্তায় জিনিস কেনার ভেতরে একটা পারমার্থিক তৃপ্তি আছে। আমার নিজেব বিশ্বাস ও ধারণা যে এ কাজে মেয়েদেরই বেশি যোগ্যতা। একবার দেখেছিলুম, একখানি শাড়ির দর ফেরিওয়ালা হাঁকলে সাতাশ টাকা। তার উত্তরে মহিলাটি বলে বসলেন বারো টাকা। আমি তো ভেবেছিলুম তিনি অপমানিত হবেন, যেমন বহু ফেরিওলা পুরুষদের ক'রে থাকে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হলুম যখন এক ঘণ্টা কাল ধস্তাধস্তির ফলে ফেরিওলা চোদ্দ টাকাতেই শাড়িখানা দিয়ে গেল। আমার এক আত্মীয় বন্ধু আছেন যিনি কিছুতেই বড় দোকানে ঢুকতে চান না। "এক দাম" "বাঁধা দর" প্রভৃতি নিরর্থক কথাগুলোর ওপর তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা। তিনি বলেন, "দাম এক বল্লেই এক হবে? তার নড়ন-চড়ন নেই? বাঁধা দর আবার কি বস্তু? দর

যদি না বাড়ল-কম্‌ল, দর কষাকষিটাই না হ'ল, তাহ'লে আর দর কিসের ?" এই জন্যে তিনি নিউ মার্কেট ছাড়া জিনিস কেনেন না এবং ষোল টাকার জিনিস যখন তিনি সাত টাকা বারো আনায় রফা করেন, উপরন্তু ক্যাশ-মেমো না লিখিয়ে সেল্‌স্‌ ট্যাক্‌স্‌টাও খারিজ করিয়ে নেন, তখন তাঁর কৃতিত্বে বিস্মিত না হয়ে পারি নে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যে আশ্চর্য ধৈর্য নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে দরাদরি করেন, তাতে মনে হয় সময় অপচয় করার মতো আরো অনেক সময় তাঁর হাতে আছে। কিন্তু না—তিনি সত্যিই কাজের মানুষ। এই যে দরাদরি করতে গিয়ে নিউ মার্কেটে সমস্ত দুপুরটা চলে গেল, তাতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ নন্। উপরন্তু তিনি বলেন যে, আর পাঁচ জায়গায় ঘুরে মনোমত জিনিস না পেয়ে যে সময়টার অপব্যয় হ'ত এবং বেশি দাম দিতে হ'ত, তার চেয়ে এক জায়গায় কিছু বেশি সময় দেওয়া মোটের ওপর ভালোই। এই জন্যেই বহু মেয়ে তাঁকে 'শপিং'-এর সময়ে আদর্শ সঙ্গী বলে বিবেচনা করেন। তাঁকে রাস্তায় একলা বড় একটা দেখিনে, সঙ্গে অন্ততঃ একজন মেয়ে থাকেনই। দেখা হলেই নিজে থেকে বলেন, "একটু কাজে যাচ্ছি।" তবে পরিতাপের বিষয়—তিনি আদর্শ গৃহস্থ এবং সওদা-নিপুণ হলে কি হয়, বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি আজও অবিবাহিত। তাঁর ভাগ্‌নীর সংখ্যা অনেক। কাজেই বহু-বান্ধবী ভাগ্‌নীদের তদ্বির আর ফরমাস খাটতেই তাঁর অনেকটা সময় ও উৎসাহ

ব্যয় হয়ে যায়। সবাই তাঁকে চায় ও ডাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় "মামা" বলে। আমার নিজের ধারণা হ'ল এই যে, তাঁর মত কৃতী পুরুষকে সব তরুণীই অকপটে বিশ্বাস করেন, কাজের ভার দেন, এমন কি বহু টাকাও তাঁর হাতে ছেড়ে দেন এই আশায় যে, তিনি ভালো বাজার করবেন এবং সুবিধা দরেই। মেয়েদের কাছে তিনি বিশ্বস্ত, প্রিয়, নির্ভরযোগ্য সঙ্গী মাত্র। তাঁর হাতে টাকা দেওয়া যায়, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়াও যায়, কিন্তু চিরকালের জন্যে হাতখানি ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমার মনে হয় তিনি যদি কখনো বিয়ে করতে প্রস্তুতও হন, তাহ'লেও তাঁর মনে হবে, এর চেয়ে ভালো এবং সস্তায় 'বারগেন' করা যায় কি না। আরো দু'-চার জায়গা ঘুরলে হ'ত।

যাই হোক্, সুবিধা বুঝে দাঁও বাগানো—এটা শক্ত আর্ট এবং বহু দিনের সাধনার অপেক্ষা রাখে। অনেক বার জিতেও এক একবার ভয়ানক ঠকে যেতে হয়। কিন্তু তাতে নেশা কমে না, জেদ বেড়ে যায় মাত্র। দু'এক বার অক্‌শ্যানে গিয়ে দেখেছি, কয়েক জন ভদ্রলোক প্রতি রবিবারেই নিলামে যান। প্রথম প্রথম এই যাওয়াটাই হ'ল বড় শিক্ষা। কেন না, তাতে নিলাম-ঘরের হাল-চাল, কেমন করে জিনিসের দর আপনা আপনিই বাড়ানো হয়, এই সব তথ্যগুলো আয়ত্ত হয়। অক্‌শ্যানে গিয়ে দর হাঁকবার আগে বেশ কিছু দিন যাতায়াত করা ভালো, যেমন ভালো গাইয়ে হতে গেলে ভালো আসরে গিয়ে শ্রুতিটা ঠিক ক'রে নিতে হয়। নইলে

আমার এক বন্ধুর মত, খাঁটি রূপো ভেবে দু'টো নিকেলের ফুলদানি চল্লিশ টাকায় কিনে চিরকাল আফশোষ করতে হবে।

যাঁদের পুরানো বই সংগ্রহ করার নেশা আছে, তাঁদেরও 'বারগেন'-প্রীতি লক্ষণীয় বস্তু। অবিশ্যি, জিনিস বুঝে দাম। কিন্তু যে সব পুরানো বুক-স্টলের মালিক বইয়ের আসল দাম জানে না, সেই খানেই দাঁও মারার সুবিধা। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ছোট দোকানে, কলেজ স্ট্রীটের রেলিং ও ফুটপাতে অনেক সময় যে সব ভালো লোভনীয় বইএর সন্ধান পেয়েছি, তা অন্য কোথাও আর মিলবে না। বারো আনায় কিনেছিলুম ও' হেন্‌রির শ্রেষ্ঠ গল্প-সঙ্কলন আর মাত্র আট আনায় পেয়েছিলুম চেলিনির আত্ম-জীবনীর একটি মূল্যবান্‌ পুরাতন সংস্করণ শিয়ালদার পুরানো বাজারে ভাঙা ফার্নিচারের মধ্যে। এগুলো প্রকৃতই "বারগেন" —তাই বহুদিন মনে থাকে।

'বারগেনের' প্রতি আমাদের যে ঝোঁক, তার দু'টি কারণ। প্রথমতঃ, জিনিসটি আমাদের পছন্দসই এবং লোভনীয় আর দ্বিতীয়তঃ, সেটি অল্প মূল্যে অথবা ফন্দি-ফিকিরে হস্তজাত করবার ইচ্ছা। অতএব 'বারগেন' করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তা' দু'টো কুচো চিংড়ি ফাউ নেবার বেলাতেই হোক, আর বহুমূল্য জমি, বাড়ি বা আসবাব কেনবার ক্ষেত্রেই হোক। তবে দরাদরির কৌশলটা কঠিন। আপনাকে এ রকম নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হবে, যেন জিনিসটির প্রতি আপনার কোনো লোভ বা স্পৃহা নেই। সস্তায় দিলে নিতে

পারেন, এই পর্যন্ত। আপনার বলা দামটা যখন দোকানদার অত্যন্ত কম বলে উড়িয়ে দেবে, তখন আপনিও ব্যাগটি পকেটে ফেলে 'তবে থাক্' বলে বেরিয়ে আসবেন—যেন আপনার কোন গরজই নেই। পিছন ফিরে কিন্তু তাকাবেন না—কিছুক্ষণ পরেই শুনবেন—"ও বাবু, শুনুন একবার শুনুনই না—কি দিতে পারবেন, ঠিক বলুন তো··" তখন ধরে নিতে পারেন যে জিনিসটি আপনার সম্পত্তি হয়ে এসেছে।

সওদা করার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের নেশা আছে, সেটা ব্যক্তি ও বস্তু-নিরপেক্ষ। পরের বাজার করতে গিয়ে অথবা পাঁচ পোয়া আলুর জায়গায় আড়াই সের আলু কিনতে গিয়ে যেটুকু লাভ, সেটুকু হয়তো সামান্যই এবং নিজের পকেটেও যায় না। তবু দর করাটা এমনি মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, না ক'রে পারা যায় না। ক্ষুদ্র সাংসারিক স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক কেনা-বেচা থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় ব্যাপারে এবং রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যবস্থায় যাঁদের দরাদরির ক্ষমতা প্রসিদ্ধ, লোক তাঁদের কূটনীতি-বিশারদ বলে সমীহ ক'রে চলে। রাজনীতির ভাষায় এঁরা হলেন 'ডিপ্লোম্যাট'। নিপুণ সতর্কতার সঙ্গে এঁরা কাজ করেন, অনেক সূক্ষ্ম ছিদ্র রেখে দেন যাতে নির্গমপন্থা অদৃশ্য ভাবে কার্যকরী হয়। সামাজিক মেলা-মেশায়, দলাদলি অথবা আরো বড় হাঙ্গামায় যাঁরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভার-সাম্য-নীতি অনুসরণ ক'রে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য এবং ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষা করতে জানেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠা বাড়ে। বেফাঁস কাজ অথবা কথা

কোনটাই তাঁরা করেন না বা বলেন না। এই নির্বিকার আত্মস্থ ভাবটি আয়ত্ত করা কঠিন। কিন্তু এটিই বস্তুবাদ আর 'বারগেনিং'এর মূল সূত্র।

দরাদরির সঙ্গে দলাদলির একটা নিবিড় যোগ আছে। কেন না, দলীয় প্রাধান্য বজায় রাখতে হ'লে দর-কষাকষি এবং দর-বাড়ানোর নিপুণ ও সূক্ষ্ম আইন-কানুন ভালো ক'রে জানা চাই। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা আদর্শ নিষ্ঠা ও সঙ্গতিবোধ দূরে সরিয়ে 'পাওয়ার পলিটিক্স' এবং দরাদরি করতে ওস্তাদ, ইতিহাসে তাঁদেরই জয়-জয়কার ঘোষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তেমনি যে সব লেখক সাহিত্য-শিল্পের মূল সূত্র, মর্য্যাদা ও সাধনার চিন্তায় অযথা পীড়িত না হয়ে সুযোগমাফিক মেশেন, লেখেন এবং দল তৈরি করতে পারেন, তাঁদের দর ও কদর বেশি হয়, দেখা গিয়েছে। কারণ, রাজনীতিই বলুন আর সাহিত্য অথবা সামাজিকতাই বলুন, সব জিনিসেরই একটা সাময়িক চরিত্র আছে। শাশ্বত মূল্য-বিচারে জন সাধারণ নির্বিকার, এই সত্যটা বুঝে যাঁরা আপন-আপন কর্মক্ষেত্রে সাময়িক ঘটনা বা রীতি-নীতির স্বাভাবিক ঝোঁক-টাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ব্যবহারে লাগাতে জানেন, তাঁদেরই পাল্লা ভারি থাকে। এতে আপত্তি করবারই বা কি আছে? সমাজতত্ত্বের উচ্চ আদর্শটাকে খাড়া ক'রে, জীবনের যথার্থ মর্য্যাদা সামনে রেখে আপনিই বা কি এমন লাভবান্ হলেন বা হতে পারবেন? অথচ আপনার চেয়ে কম বিবেকবুদ্ধি, কম খুঁতখুঁতে মন আর কম সঙ্কোচহীন দৃষ্টি

নিয়ে কত অল্প সময়ের মধ্যে আর একজন ঝোপ বুঝে কোপ মেরে সাঁ-সাঁ ক'রে এগিয়ে গেল। আপনি যতক্ষণ জীবনের তথ্য নিরূপণে ব্যস্ত, তিনি ততক্ষণ জীবিকার তত্ত্বকে করায়ত্ত ক'রে ফেলেছেন। আপনি যত খুঁজে মরছেন আত্ম-সংস্থিতি, তিনি ততক্ষণ ক'রে নিয়েছেন আত্ম-সংস্থান। এখন আপনিই মন স্থির ক'রে বলুন—জগতে কোন্‌টা বড়, নিষ্ঠা না প্রতিষ্ঠা? এক দর না দরাদরি?

চার দিকে যখন অশান্তি আর দলাদলি, আপনি বিমূঢ় হয়ে ভাবছেন মানবিকতার প্রকৃত অর্থ, সমাজ ও দেশের কর্তব্য, স্বাধীন ও সাধু-চিত্তের নিরপেক্ষ নীতি। ইতিমধ্যে হয়তো একটি সম্প্রদায়, সুনেতৃত্বের কল্যাণে দুই দলের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে যার কাছ থেকে বেশি সুবিধা পাওয়া যায় সেই দিকে ঝুঁকে আদর্শবিরোধী স্বার্থসিদ্ধি ক'রে নিল। এটা সহজ, পরিচিত, প্রমাণিত সত্য—বাস্তব জগতে বহু বার এর মূল্য পরীক্ষা হয়ে গেছে। দুনিয়ার হাল তো এই! যে সংসারে তিন ভাই কিন্তু এক ভাইয়ের রোজগার কম এবং প্রতিষ্ঠাও অল্প, সেখানে সে বাঁচে কি ক'রে? আপন স্বার্থ কায়েম রাখার জন্যেই বাকি দু'জনের ভেদ সৃষ্টি ক'রে যার কান পাতলা, পকেট ভারি ও মগজ হাল্‌কা, তার দিকেই ঝুঁকতে হবে। উপায় কি?

হট্টশ্রী

হট্টশ্রী কথাটি আমারই মনের একটা মোলায়েম প্রচেষ্টা মাত্র।

সাধারণ ব্যবহারে আমরা হাট-বাজারেরই উল্লেখ ক'রে থাকি। আর সে হাট-বাজারে না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ। বরঞ্চ আছে এমন একটা আবহাওয়া যেটা শিষ্টতার অনুকূল নয়, ব্যবসায়িক কদর্যতাকেই যেন পুষ্ট এবং প্রসারিত ক'রে দেয়। আগেকার দিনে হট্টের মধ্যে যেটুকু শ্রী ছিল, সেটুকু আজকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু গোল। কেন এই রূপান্তর হয়েছে, কথাটা বলি!

'হাটে বাজারে' কথাটিকে আমরা এতই ব্যবহার-মলিন ক'রে ফেলেছি যে ওর সঙ্গে ধামা আর ছালা আর থলের জটিল দুর্গন্ধের ঘনিষ্ঠ অন্বয়, ভনভনে মাছি এবং পচা ফল ও চিটে গুড়ের গাঢ় অবলেপ। কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে আসে একটা অনৈক্যতানের আদিম হট্টগোল, সের-বাটখারার মরচে-ধরা আওয়াজ, দরাদরির প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক তীক্ষ্ণ প্রয়াস—এবং সর্বোপরি মাছের আঁসটে জল, ডাবের খোলা এবং কলার খোসার স্তূপীকৃত আবর্জনা বাঁচিয়ে কনুই ঠেলে পিছিল পথে অগ্রসর হওয়ার করুণ চিত্র। এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন কষ্টের ছবিটা এতই বিশ্রী রকমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সেই দুঃস্থ

মনোভাবকে আমরা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চাই। সাহিত্যে তো নয়ই, জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি অনর্থক, অরুচিকর এবং গ্লানিকর।

তাই যে-সব নাগরিক গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য বিড়ম্বনা এবং তারই আনুষঙ্গিক বাস্তব পরিবেশটুকু বরদাস্ত করতে পারেন না, তাঁরা আশ্রিত আত্মীয়-অনাত্মীয়, অভাবে ঠাকুর-চাকরদের হাতে দোকান বাজারের ভার ছেড়ে দিয়ে সকালে উঠে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজেই মনোনিবেশ করেন। অপটু, অনভিজ্ঞ এবং অদীক্ষিত বলে তাঁরা গঞ্জনা শোনেন মাত্র, কিন্তু সংসারের ক্লান্তিকর ঝামেলা থেকে তাঁরা এক রকম রেহাই পেয়ে যান। ঘাড় পেতে রাখলেই কর্তব্য আর সংসারের যাবতীয় কাজ ঘাড়ে আপনি এসে চেপে বসবে। তাই মেরুদণ্ড-হীন হয়েও মেরুদণ্ড সোজা রাখা একটা বিশিষ্ট শিল্প। আমি এই শিল্পসাধনা ক'রে অপবর্গ লাভ করেছি। কেউ আর আমাকে এখন কোনো কাজ করতে অনুরোধ জানায় না, পাছে সব ভণ্ডুল ক'রে দিই। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি হলেই হয় না, চক্ষুর স্তিমিত এবং মুদ্রিত ব্যবহার আত্মশান্তির পক্ষে অপরিহার্য। তা ছাড়া, প্রত্যেক ঘরেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, নিঃশব্দ পরোপকারের চেয়ে সঘোষ শিক্ষাদানেই যাঁর পারমার্থিক আনন্দ। ভেবে দেখুন, ঘরে যদি ছোটোমামা, সেজকাকা অথবা মেজোপিসেমশাইয়ের অযাচিত অকৃপণ সাহায্য সুলভ হয়, তা হ'লে কোন্ ভদ্রসন্তান সকালে দ্বিতীয় দফা চা-পানান্তে বেলা ন'টা পর্যন্ত কিছুই না ক'রে বিশুদ্ধ স্ফূর্তিতে উদ্ভাসিত

হয়ে না ওঠেন? নিদেনপক্ষে, সর্বকর্মপটীয়সী গৃহিণী তো আছেন। তা হ'লে দেখবেন, দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে এবং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আপনি যথাসময়ে কর্মস্থলে প্রেরিত হয়েছেন।

কিন্তু যাঁরা নিরুপায়, নিঃসহায় এবং নিরভিভাবক, তাঁদেরই সহ্য করতে হয় হাট-বাজার করার প্রাণান্ত দুর্ভোগ। তাঁদের কাছে হাট-বাজারের অর্থই হল একটা বিশ্রী রকমের দৈনন্দিন দায়িত্ব, যেটা উদরের ইন্ধনস্বরূপ হলেও রসনায় ঠিক রস সঞ্চার করে না। যাঁদের বাজারে বেরবার দরকার করে না অথবা প্রথম দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যাঁরা সরকার দরোয়ান নিয়ে মোটরে মার্কেটে গিয়ে আপনারই হাতে-গড়া আভিজাত্য-টুকু অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁদের দৃষ্টিটা হল স্বতন্ত্র, দুনিয়ার উপর অনুকম্পার দৃষ্টি। আর যাঁরা দুই দলের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ফরমায়েসমতো সৌখিন 'শপিং' করেন আবার প্রয়োজন হলে ঝি-চাকর-পালানোর দুর্দিনে সন্ধ্যায় কাঁচা সব্জির বাজার সেরে রেখে সকালে উঠে দাড়ি না কামিয়েই মাছের পাত্রটা হাতে ক'রে বাজারে ছুটতেও তেমন দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁদেব মনোভাবটা হ'ল খাঁটি মধ্যবিত্তের—অর্থাৎ কিছুটা বিব্রত, কিছুটা নির্বিকার, খানিক বিরক্তির, খানিক কৌতুকের। হরেক রকম ঝক্‌মারির বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হলেও, এঁদের চোখে থাকে তির্যক্ সহিষ্ণুতা, মনটাও থাকে জাগ্রত। তাই এঁরা দেখেন ও শেখেন বেশী।

এই অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত কম নয়। হাটে-বাজারে

নিত্য চলন্ত আর জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শে এসে কত দৃশ্য ও চরিত্র বাস্তব ও মূর্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা পাকা ব্যবসায়ী, বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁরা তো এই হট্ট-লব্ধ মানবচরিত্রজ্ঞানকেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেন। আর যাঁরা রচনাকুশলী, হট্টশ্রীতে আস্থাবান্, তাঁদের ভাবনার ও রচনার অনেকখানি খোরাক তো মিলবে এইখানেই। হট্টমনের বিচিত্র স্পন্দন যাঁরা ঠিকমতো ধরতে পারেন, তাঁরাই তো সত্যিকারের জননায়ক। আর যাঁরা নিখিল হট্টমন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁরাই তো নির্জাতিক যাযাবর, খাঁটি মুসাফির।

বর্তমানে হাটের চরিত্রে ও বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের এটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পণ্যই যখন মুখ্য, মানুষ তখন গৌণ। রূঢ় দ্রব্য যখন কারু-পণ্যে পরিবর্তিত হয়, হট্টশ্রী তখন রূপান্তরিত হয় বিপণি-সজ্জায়। তাই হাট-বাজার আর দোকান-পসারের মধ্যে আছে অনেকটা পার্থক্য। প্রথমটায় আছে গতির আভাস, দ্বিতীয়টিতে স্থিতির। একটি হ'ল যাযাবর মানুষের ও মনের প্রতীক; অপরটি হ'ল স্থাণু, নিশ্চিত ও নিরাপদ মনের পরিচয়। একটিতে পাই ধুলো আর মাটি আর খোলা আকাশ; অপরটিতে গদি অথবা কেদারা এবং বিজলি পাখা। শতবার হাটে ঘুরে বেড়ালেও তাকে আমরা বাঁধতে পারি না, আয়ত্ত করতে পারি না তার সমগ্র সরণশীল সত্তাকে। কিন্তু দোকানকে আঁকড়ে রাখি তালা-চাবি, সাইন-বোর্ড আর 'নিয়ন' লাইট দিয়ে। হাট যখন ভাঙে, গোধূলির আলোয় তার ভাঙা

চেহারা মনে আনে কাব্যের আবহ। নিস্তব্ধ প্রান্তরে বট-পাকুড়ের শাখায় বাদুড়ের কিচিমিচি, জনহীন হাটের প্রাঙ্গণে শূন্য গুড়ের কলসীগুলোর গড়াগড়ি, আলকাত্‌রা-মাখানো জীর্ণ দু-একটি দরজায় বাতাসের অদ্ভুত আওয়াজ আর ঘনায়মান অন্ধকারে উপুড়-করা কালো কালো মেটে হাঁড়িগুলো এমন একটি অতিনৈসর্গিক রিক্ততার ছবি ফুটিয়ে তোলে, যেটি ঘুমন্ত শহরের নির্জনতম পথে বন্ধ দোকান-পাটের গায়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা শুধু প্রকৃতি-পটভূমির গুণ নয়, দ্রব্যেরই গুন। হাট যতক্ষণ বেঁচে থাকে, প্রচুর কোলাহলের মধ্য দিয়েই তার জীবন-ঘোষণা। আবার মৃত্যু যখন নামে, সম্পূর্ণ তার পরিসমাপ্তি—নীরন্ধ্রতার অবলুপ্তির অন্ধকার। দোকান-পাট কিন্তু মরেও মরে না। তাদের চেহারা ভয়াবহ রকমের নিঃস্ব লাগে না। তারা মূছিত মাত্র; নাগরিক জীবনের স্তিমিত ধারায় তারা ঝিমিয়ে থাকে। একটিতে রয়েছে গ্রাম্যতার সরল স্পর্শ; অপরটিতে আছে নাগরিকতার জটিল ছাপ।

দু-জায়গাতেই অবশ্য দরাদরি চলে। কিন্তু যে মানুষ হাটে গিয়ে ঝিঙের দর আগুন বলে ফড়েকে হুমকি দেয় কিংবা মেছুনিকে সোনার নিক্তিতে ওজন করতে দেখে ঝাঁ ক'রে দুটো কুচোচিংড়ি থলের মধ্যে পুরে নেয়, সেই ব্যক্তিই দোকানে গিয়ে বাঁধা দরের অতিরিক্ত সেলামি দিয়ে কেনে যৌতুকের বাসন, আদ্দির থান অথবা বিলিতি সিগ্‌রেট। রসিদ চাইবার দরকারও বোধ করে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম-কষাকষি চলে, কিন্তু দু-এক পয়সা নিয়ে অভব্যতা কিংবা হট্টগোলের সৃষ্টি

খুব কমই হয়ে থাকে। তা ছাড়া হাটে গেলে মেলে প্রাণের ও প্রকৃতির পরিচয় মানুষের মুখে আর সবুজের ডালায়,—চাষীদের স্বেদসিক্ত পেশীবহুল দেহে আর নধর আনাজের শ্যামশোভায়। সেখানে ছড়ানো থাকে পসরা, চলে বেসাতি। দোকানে মজুত থাকে মাল। নিখুঁত ভাবে সাজানো থাকে প্রসাধনের ডালি। সেখানে কোলাহল নেই কিন্তু অন্তরঙ্গতার অভাব। হাটে গেলে আমরা হাঁটি, ভদ্র-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে নিছক ঘুরে বেড়াই। গণতান্ত্রিক বিচরণের ফাঁকে অবসর-মতো জিনিস দেখি, দর শুনি, যাচাই করি। তারপর মনের মতন সওদা না পেয়ে হয়তো শুধু হাতেই ঘরে ফিরি। দোকানে কিন্তু জিনিস কিনতে এসে আমরা ভদ্রমাফিক কায়দায় কথা বলি, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি, শো-কেসের কাচের পাল্লায় দেখি নিজেদেরই লোলুপ প্রতীক্ষমান দৃষ্টি। দরদস্তুর একটু আধটু করি বটে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আর কিছু না কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার ভরসা রাখি না। তা হ'লে স্বল্পায়তন পকেটের সঙ্গে গড়ের মাঠের বিস্তৃত সাদৃশ্যের অবারিত ইঙ্গিত শোনবার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

এ কাজ বরঞ্চ পারেন এবং, দু'একবার দেখেছি, করেও থাকেন মেয়েরা। দোকানদার হয়তো একটার পর একটা জিনিস মেলে ধরছেন কোনো মহিলার সামনে। কিন্তু কিছুই পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। কাঁচা সেল্‌স্‌ম্যান মরিয়া হয়ে এটা পাড়ছে, ওটা দেখাচ্ছে আর মনোরঞ্জনের আশায় অজস্র বাক্য

ব্যয় করছে। কিন্তু খদ্দেরের অন্যমনস্ক চোখে কোনো রঙই ধরছে না। অবশেষে স্তূপাকার জিনিস পাড়িয়ে অনেক্ষেণ নাড়াচাড়া ক'রে একটা বেছে নিয়ে বললেন: "এর চেয়ে ভালো আর কিছু নেই, নতুন ধরনের? দামটাও শস্তা মনে হচ্ছে যেন—কী জানি, খেলো জিনিস ব্যবহার করি নি তো কখনো!" হল অ্যাণ্ড্ অ্যাণ্ডার্সনে অ্যাকাউন্ট্ আছে জেনে আর সেজো ভাইয়ের পিস্শ্বশুর হাইকোর্টের জজ শুনে সেল্স্ম্যান যখন অভিভূতপ্রায়, তখন অনুকম্পার হাসি হেসে হয়তো মহিলাটি বলে ওঠেন: "দিন ঐটেই। কি আর করা যাবে! সরেস জিনিস কিন্তু স্টক্ করবেন এবার থেকে। (নজরের কাছে দামের প্রশ্ন কিসের?")

তারপর ক্যাশ-মেমো যখন লেখা হয়ে গিয়েছে, হাতব্যাগটা সশব্দে বন্ধ ক'রে তিনি ঝাঁঝিয়ে ওঠেন: "আবার সেল্ ট্যাক্স ধরছেন কেন? এই তো জিনিস আর এই দোকানের ছিরি...!" বলেই অত্যন্ত বিরক্তিভরে বেরিয়ে যান।

কাউন্টারের পেছন থেকে ক্যাশবাবু নিকেলের চশমাখানি নামিয়ে অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেন: "তুমিও যেমন ছোকরা! এখনও অনেক শিখতে বাকি তোমার, বুঝলে হ্যা..."

তরুন সেল্স্ম্যান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিনিসগুলো সরিয়ে গুছিয়ে রাখে। পুরুষ খরিদ্দার হলে ব্যাপারটা কী রকম অপ্রীতিকর দাঁড়াত, তাই ভেবে শিহরিত হই আর মহিলাটির নিপুণ দুঃসাহসে চমৎকৃত হই।

পুরুষরাও কিছু বাদ যান না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভাব বিকাশ হয়ে থাকে। মেয়েদের যেমন নিজস্ব ডিপার্টমেণ্ট্ আছে—শাড়ি বাসন কিংবা গহনার দোকানে দেখি তাঁদের নিত্য আনাগোনা, পুরুষদেরও তেমনি স্বকীয় বিভাগ আছে—যেমন জামাকাপড়, জুতো, বই, সিগ্রেট কিংবা মনোহারী দোকান। সেখানে দেখি তাঁদের দরদস্তুর করবার ক্ষমতা এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে লম্বা বিলের পাওনা না মিটিয়ে হাওয়া হয়ে যাবার অস্বাভাবিক নৈপুণ্য।

কিন্তু সে কথা যাক। বর্তমান যুগে, নাগরিক সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে হাটের হট্টচরিত্র ঘুচে গিয়ে যেমন বাজারে পরিণত হয়েছে, আর ঝাঁপ্‌লাগানো দোকান রূপান্তরিত হয়েছে কোল্যাপ্‌সিবল্‌-গেট-দেওয়া ফ্যাশনেব্‌ল্ মার্ট্ বা মার্কেটে, তেমনি সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি শপিং-এর ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষের এলাকা আব পৃথক্ ভাবে চিহ্নিত নেই। প্রৌঢ়া মহিলারা সন্ধ্যাব পব অনায়াসেই বাজার করতে বেরোন। বেশভূষাটা পুরুষদের চেয়ে বেশি ভদ্র এবং মার্জিত, এই যা তফাৎ। পিছনে ঝুড়ি-হাতে চাকর কপি মূলো আলু পটল আর লাউকুমড়ো এবং বোঝার ওপর শাকের আঁটি বয়ে বেড়ায়। একটি পয়সাও দস্তুরিবাবদ ট্যাঁকে যেতে পায় না। অবিশ্যি এক হিসেবে এ ব্যবস্থা ভালোই বলতে হবে। কী দিয়েই বা সকালের রান্না, আর কোন্ কোন তরকারি রাতের বরাদ্দ, পুরুষদের আর মেয়েদের জন্য কী রান্না আলাদা হবে বা হওয়া উচিত, কোন্ অনুপানের সঙ্গে সঙ্গে কোন্

ব্যঞ্জনের উপকরণ নেওয়া যায়, এটা মেয়েরাই তো বেশী বোঝেন। প্লানিং-এর অঙ্গ-স্বরূপ ছক্‌টা তাঁদেরই হাতে। তা ছাড়া, লাউ রান্না হবে আমিষ না নিরামিষ, আমিষ হলে ঝটকা-চিংড়ি অথবা কাঁকড়া-সহযোগে, এ-সব কথা পুরুষেরা কী ক'রে জানবেন ? তাঁরা জানবেন হাটের দর, রাখেন হাটের খবর। কিংবা ছোটো বৌ ট্যাংরা মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, বড়ো গিন্নী শিম-বেগুন-বড়িভাতে খেতে ভালো-বাসেন, আর সেজদি মন্ত্র নেবার পর থেকে কাঁকড়া ছোঁন না—এত গুহ্য ঘরের খবর মনে রাখবেন কী ক'রে ?

তা ছাড়া, আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি মেয়েরা সত্যিই হাট-বাজার করেন ভালো। বাজে পয়সা নষ্ট না ক'রে, একসঙ্গে অনেক সবজি না কিনে এবং সংসারের সাশ্রয় ক'রে তাঁরা যেমন পরিপাটি বাজার করেন, পুরুষরা তেমন পারেন না। পুরুষ বাজারে যান আসেন যন্ত্রের মতো। একই সজনের ডাঁটা অথবা থোড়- বড়ি কিনে নিয়ে রোজই বাড়ী ফেরেন পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই। নারী চলেন ধীরে মন্থরে। পাঁচটা জিনিস দেখেন-শোনেন, যে পটলওয়ালা ডাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে যান, দর করেন, মনে মনে ভেবে দেখেন, তারপর হয়তো বলেন ঃ "এই পটল বাছাই ক'রে দিলুম। সাত আনার বেশি সের দেব না—আগে থাকতে বলে রাখছি কিন্তু। তোলো পাঁচ পো।" 'পাষাণ ঠিক আছে মা,' বলতে গিয়ে পটলওয়ালা গৃহিণী-সুলভ ভ্রূকুটির এমন ধমক খায়, যে সেই নির্মম পাষাণদৃষ্টির সামনে নতমুখে পাল্লা

ফিরিয়ে ওজন না ক'রে সে পথ পায় না। দাম দেবার সময় দেওয়া হল ন' আনা। বাকি পয়সাটা ফেরৎ না নিয়ে তিনি পাশের ডালাখানির দিকে ইঙ্গিত করবা মাত্র বেচারি তাড়াতাড়ি এক মুঠো কাঁচা লঙ্কা তুলে দিতে বাধ্য হয়। তবুও হয়তো মনঃপূত হল না— যদিও তাতে জন পাঁচেক বলিষ্ঠ পুরুষের পাকস্থলী অনায়াসেই জর্জ্জরিত হয়ে যেতে পারে।

যে-সব পুরুষ নিত্য হাট-বাজার ক'রে থাকেন, তাঁরা সবজি কিনতে গিয়ে এক-আধ পয়সা বাঁচানো কিংবা অযথা সময় নষ্ট করা ভালোবাসেন না। তাঁদের নজরটা মাছ-মাংস এবং ফল-মূলের ওপরই যেন বেশি। অনেক বাড়িতেই অবসর প্রাপ্ত কর্তা-ব্যক্তি বা অভিভাবক আছেন। আজ-কালকার ছেলেছোকরাদের সাংসারিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব-জ্ঞানের উপর তাঁদের প্রচুর অবজ্ঞা। নিত্য বাজার এঁরা নিজ হাতেই ক'রে থাকেন। সে ভারটি আর কাউকে প্রাণ ধরে বিশ্বাস ক'রে ছাড়তে পারেন না। পচা ভাদ্দরে বেশি রোদ্দুর লাগলে ব্লাড-প্রেশার বাড়বে বলে তাঁরই শরীরের খাতিরে দাপট-যুক্তা গৃহিণী যদি বাজারে বেরুতে তাঁকে কোনোদিন অনুমতি না দেন, তা'হলে সারাটা দিন তাঁর মেজাজ খারাপ থাকে আর সন্ধ্যার পরই মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করছে বলে শুধু একটু দুধ খেয়েই শুয়ে পড়েন।

বাজার করার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়! যিনি যে প্রকৃতির মানুষ, তিনি সেই রকম জিনিস কিনে থাকেন। অর্থাৎ যাঁর অগ্নিমান্দ্যের প্রকোপ

এবং বায়ুপ্রধান ধাত, তিনি নিত্যই কাঁচা পেঁপে, পাকা বেল, ওল, পলতা এবং সরু জিয়ল মাছ কেনেন। আর যাঁর স্বাস্থ্য ভালো, হজমশক্তি অটুট, তিনি পোস্ত, এঁচড়, ডিম মাংস এবং ইলিশেরই পক্ষপাতী। কেউ বা দৈনিক বরাদ্দের মধ্যেই কাটা পোনার টুকরো সমেত গুছিয়ে বাজার করেন, অধিকন্তু ফেরবার পথে মোড়ের দোকান থেকে গৃহিণীর জন্য পান আর আচারটুকু নিতে ভোলেন না। কেউ বা আবার একটু বে-হিসাবি, লুকিয়ে পকেট থেকে ডেফিসিট পুষিয়ে দেন। সতেরো সিকের ভোম্বল-মার্কা কাৎলাটাকে হাসি-হাসি মুখে সতেরো আনার পরোয়ানা দিয়ে বেপরোয়া ফেলে দেন বাড়ির উঠোনে। শস্তায় মাছ কেনার কৃতিত্বে এবং ধরা পড়ার ভয়ে তাঁর মন তখন খাবি খাচ্ছে। এই কম দামে জিনিস পাওয়া আর আড়ৎ থেকে মাল কিনে আনার মোহ অনেক ভদ্রসন্তানের মধ্যেই আছে। এরই আকর্ষণে শ্যামপুকুর থেকে বাঁড়ুজ্যে মশাই ছোটেন চিৎপুরের তামাক আর বড়বাজারের দরে ঝাড়াই মসলা, ডাল, সুপারি আর বালতি-কড়াই কিনতে। ভবানীপুর থেকে হালদারমশাই পাড়ি দেন বেলগেছের খাল-ধারে চণ আর ভূষি মাল খরিদ করার জন্যে, আর চাঁপাতলা থেকে নন্দীবাবু হাতকাটা ফতুয়া পরে আর কোমরে গেঁজে বেঁধে ধাওয়া করেন চেৎলার হাটে মশারির থান, বিচুলি, সরু চিঁড়ে আর বঁড়শির শক্ত সুতোর সন্ধানে। বালিগঞ্জ কিংবা রীজেন্ট্স্ পার্কের মিঃ বাসুকেও কখনও কখনও ছুটতে হয় বৈকি ঘরোয়া

তাগিদে হাওড়ার হাটে শস্তায় গামছা এবং তাঁতের রকমারি শাড়ির নতুন নতুন পাড়ের আশায়।

আজকাল দেখতে পাই—মেয়েরা যাচ্ছেন সব্জির বাজারে, মাংসের স্টলে, কিংবা জামাকাপড়ের দোকানে পুরুষদের জন্য শার্ট্ স্যুটের বায়না দিতে। পুরুষরা যাচ্ছেন শাড়ি গহনা কিংবা ক্রকারি কিনতে। কখনও একলা, কখনও যুগলমূর্তি। যদি হাতে কাজ না থাকে এবং পরিচিত দোকানে গিয়ে একটু বসবার সুযোগ সুবিধা থাকে, দেখবেন নজর ক'রে ঈশ্বরের কী বিচিত্র সৃষ্টি! কত হরেক রকমের 'টাইপ্' ও 'ক্যারেক্ট্যর' আপনার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানবচরিত্রের ভিন্নমুখী প্রকাশ নিত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। কত স্বার্থপরতা, লোলুপতা, প্রবঞ্চনা আবার ভদ্রতা ও সততার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে হাট-বাজারে, দোকান-পসারে। দোকানে ঢুকে দাঁড়ানো আর কথা বলার ভঙ্গি থেকেই আপনি সেই মানুষটির ব্যক্তিগত স্বভাব, মেজাজ, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি দুর্বলতা অনুমান করতে পারেন। কত পারিবারিক সংবাদ, এমন কি অনেক গোপন তথ্য পর্যন্ত আলোচিত হচ্ছে অনুচ্চ কণ্ঠে দুই খরিদ্দারের আলাপ-সূত্রে। এক কাঠিম সুতো কিনতে গিয়ে বাজারে শুনতে পাবেন অনেক কিছু, চোখ খুলে রাখলে দেখতে পাবেন তারও বেশি। স্থানীয় পাঠাগার ও চায়ের দোকান থেকে শুরু ক'রে পাড়ার মাতব্বর-দের সমালোচনা, রেস এবং ফুটবল খেলা, স্বদেশের মুদ্রাস্ফীতি ও বিদেশের গূঢ় রাজনীতি পর্যন্ত অনেক কিছুই আলোচিত হয়ে থাকে বেশ তারস্বরেই। স্ত্রী পুরুষের কত বিভিন্ন ধরণের

হাসি বা চলার ভঙ্গি, কত লাস্যলীলা, কত মূর্খ গাম্ভীর্য, অসহিষ্ণুতা, চতুরতা অথবা চটুলতার নমুনা পাওয়া যায় প্রকাশ্যভাবে। তাই হাট-বাজারে ঘুরে বেড়ানো কিছু পরিমাণ ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হলেও জীবনযাত্রার দৃশ্যমান ছবি এরই মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে না কি, খানিকটা মজার, খানিকটা ভেবে দেখবার?

হাট কথাটারই মধ্যে রয়েছে এমনি একটা স্থূল বাস্তবের স্পর্শ যে আমরা একে এড়িয়ে যেতে চাই। ওর মধ্যে আছে অবিশ্বাস্য গুজব আর উড়ো খবর, দাঁও কষা কিংবা লাটে ওঠা—অর্থাৎ বণিক্-বৃত্তির অপ্রীতিকর অংশটা। এক কথায় ওর মধ্যে দিয়ে যেন ফুটে ওঠে আমাদের প্রাণধারণের যাবতীয় গ্লানি আর কায়ক্লেশ জীবিকার যত-কিছু জটিলতা এবং অসহায়তা। কিন্তু হাট জিনিসটা কি সত্যি অতখানি তাচ্ছিল্য ও অনুকম্পারই উদ্রেক করে, আর কিছু নয়? ওর মধ্যে কি কোনো ঐতিহ্যের স্মৃতি নেই?

এই বিচিত্র দেশের প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ ক'রে দেখুন। প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে মুসলমান-আমল পর্যন্ত কত পণ্যবাহী সার্থবাহ ভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছে এক হাট থেকে আর এক হাটে। কত আমদানি আর রপ্তানি চলেছিল মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বড়ো বড়ো গঞ্জ, শহর এবং বন্দরগুলিতে। উজ্জয়িনী, সূর্পারক, ভৃগুকচ্ছ, তাম্রলিপ্ত, পাটলিপুত্র, মথুরা, বৈশালী, ধারা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে কিসের আদান-প্রদান চলেছিল? রোম্যান

স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কাদের বৈশ্যবৃত্তি ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন করেছিল? কাদের সঞ্চয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পল্লভ, সাতবাহন, চোল, বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য এবং শিল্পকীর্তি? মধ্যযুগে আরব বণিক্‌রা পৃথিবীর হাটে ঘুরে ঘুরে কোন্ সংস্কৃতির সন্ধান দিয়েছিল? আর দিল্লি আগ্রা লাহোর প্রভৃতি শহরের বিদেশী বণিক্‌দল কী রোমান্সের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত? য়ুরোপেও মধ্যযুগে ধর্মযোদ্ধারা যখন বর্ম এঁটে খৃস্টান তীর্থ-ত্রাণে স্থলপথে অভিযান শুরু করতেন, পথে রসদ যোগাত কারা? য়ুরোপের হাটে-মাঠে-মেলায় কোন্ সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল? বাণিজ্যকেন্দ্র নগরগুলি কেমন ক'রে বড় আর স্বাধীন হয়ে মধ্যযুগের শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তারে সহায় হয়েছিল? মধ্য জার্মনি আর উত্তর ইতালির বিভিন্ন হাটে, দক্ষিণ ফ্রান্সের আঙুর-দোলানো ক্ষেতের প্রান্তে গ্রাম্য-মেলায় কোন্ কাব্য-নাট্য-সংগীতের উৎস খুলে গিয়েছিল? আমাদেরও গ্রামের হাটে আর মেলায় যে-সব লোক-শিল্প-সংগীতের নমুনা পাওয়া যেত, সেগুলির পুনরুদ্ধারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আগ্রহ দেখান কিসের জন্য? ভারতের উত্তর-পূর্বদিকে একদিন যে বিরাট্ বাণিজ্যের বসতি ছিল, শ্রীহট্ট নামটি কি তারই স্মৃতি বহন ক'রে আজও কমলা-মধু, আনারস, নানা-বিধ আনাজ সামগ্রী আর তুলো, আখ, চুণ, সুগন্ধ মশলা-পাতি এবং বড় বড় সুপারির ছালা সুরমা নদী দিয়ে রপ্তানির কারবার চালায়? কৈশোরে একবার সাতক্ষীরা অঞ্চলে বড়দলের হাট দেখেছিলুম। নোনা গাঙের মধ্যে

জলে-ভাসা দ্বীপের মতন ঘিঞ্জি জায়গায় সেই বিপুল হাটের দৃশ্য-স্মৃতি আমার মনে আজও যেমন অম্লান, রাজরোপ্পার পথে ছোট্ট একটু ঢালু জমিতে আদিবাসীদের অকিঞ্চিৎকর হাটের চঞ্চল আয়োজনটুকু বড় বয়সেও তেমনি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

হাটের অর্থই হল বাহুল্য—যে বাহুল্য আসে তার অনিশ্চিত অস্তিত্ব থেকে। কোন-এক অনির্দিষ্ট দিনে অনেক দ্রব্য, অনেক মানুষের সমাবেশ হয় কিছুক্ষণের অথবা কয়েক-দিনের জন্য। তারপর হঠাৎ যেন ফুরিয়ে যায়। এই নিঃশেষিত অস্তিত্বের কিছুটা রং লাগে গোধূলির আকাশে, পারানি নৌকার জীর্ণ পালে, ঘরে-ফেরা হাটুরের ক্লান্ত পদক্ষেপে, প্রতীক্ষমান চোখের ম্লান দৃষ্টিতে। তাই মনে হয়, হাট বোধ হয় শুধু মরানদীর একটুখানি চলাচলের স্রোত নয়, নয় কেবল বৈশ্য-বৃত্তির বিড়ম্বনা অথবা আদানপ্রদানের ধূলিমলিন অঙ্গন। ওখানে আছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি-চালনার কিঞ্চিৎ অবসর, আছে দার্শনিকতার একটুখানি অবকাশ। তা যদি না হত, তাহ'লে একাধিক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে হট্টশ্রী তার স্থূলতার আবরণ সরিয়ে, একটা কিছু সারবস্তুর সন্ধানে তাঁদের এতটা আকৃষ্ট করত না। আর এই বিশাল জগৎ একটি বিপুল হট্টমন্দিরের মতন প্রতিভাত হয়ে, তার বিচিত্র পসরা আর বেচা-কেনার বহু খণ্ড খণ্ড চিত্রের মারফৎ একটি বৃহত্তর অখণ্ড সত্যরূপের পরিচয় তাঁদের কাছে তুলেও ধরত না। খোলা হাটকে কোমল হট্টশ্রীতে মণ্ডিত ক'রে যদি

না-ও দেখি, তবু তার মধ্যে যে সহজ কৌতুক, রসগ্রহণ, শিল্পবোধ এবং বাস্তবজ্ঞানের ক্ষমতা অর্জন করবাব সুযোগ পাওয়া যায়, সে কথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

এলার্জি

প্রথমেই একটা কথা কবুল ক'রে রাখি। আমি চিকিৎসক-সাহিত্যিক নই অথবা কোনও ঔষধ-ব্যবসায়ীর প্রচার-সচিবও নই। হলে বোধ হয় ভালই হত। এক সঙ্গে দুই জীবিকার ডবল মুনাফায় গাড়ী-বাড়ী ক'রে ফেলতাম। অথবা স্বল্প পরিশ্রমে চটকদার মন্ত্র রচনায় বাণিজ্য-লক্ষ্মীর মুখখানা অন্ততঃ একবার দেখতে পেতাম। কিন্তু তা হবার নয়। শুধু লেখক। যা দেখি, যা বুঝি অথবা অনুভব করি তারি কিছুটা কথার পর কথা সাজিয়ে ধরতে চেষ্টা করি। মনের ভার খানিকটা লাঘব হয়, এই পর্যন্ত। তবে এটি বিজ্ঞাপন নয়, স্বগতোক্তি মাত্র।

পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাবেন, বাঁধা গৎ বলে একটা জিনিস আছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে কতকগুলো চল্‌তি ধুয়োর সৃষ্টি হয় এবং কিছুকাল মানুষের মনকে মোহাচ্ছন্ন রেখে অদৃশ্য হয়, বাতিল হয়ে যায়। যত দিন তাদের প্রচলন, তত দিনের মধ্যে হামেশাই সে কথাগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হয়। বিশ্বাস করি আর না করি, ইচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্ মন্ত্রের মত উচ্চারণ করি। মন্ত্র-মাহাত্ম্য কমে আসে, তারপর নূতন গৎ সৃষ্টি হয়। এই ভাবেই যত 'ইজম্' আর মতবাদ জন্মেছে, মরেছে, বিদায় হয়েছে আবার নাম ভাঁড়িয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে।

আপনি আমি এ স্থলে নিরুপায়। সভ্য জগতে বাস ক'রে তার হাল-চাল, নিয়ম কানুন সম্বন্ধে যথারীতি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করলে লোকে আপনাকে অজ্ঞ ভাববে, অবজ্ঞা অথবা করুণার চোখে দেখবে। মনে-মনে আপনি যাই ভাবুন আর প্রচলিত থিওরিতে যতই অনাস্থাবান হোন, ধরতাই বুলির কবলে পড়ে আপনাকে একবার নাকাল হ'তে হবেই। বুলি থাকলেই বোল ধরবে ও ফুটবে।

মাইক্রোব্-অধ্যুষিত জগতে জীবাণু-তত্ত্ব একদিন সিংহাসন রচনা ক'রে নিল। তখন ডাক্তারি শাস্ত্র থেকে সাধারণ পর্যবেক্ষণ আর নিরীক্ষণ বরবাদ হয়ে গেল, এল অণুবীক্ষণ। 'প্যাথলজি-কাল' কথাটি শুধুই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নয়, মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য এমন কি সামাজিক আলাপ-আলোচনার মধ্যেও শিকড় গেড়ে বসল। ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে কোনও কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না। পটাশ্ পারমাঙ্গনেড, ডেটল, ডি ডি টি, ব্লীচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে-মুছেও অদৃশ্য বিভীষিকা দূর করা গেল না। অস্পৃশ্য শত্রুর কাল্পনিক মারকত্ব যেন শত গুণ বেড়ে গেল। 'যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবলি জীবাণু দেখি'—এই গোছের অবস্থা। মনে হত বীজাণুপূর্ণ পরিবেশে নিঃশ্বাস টেনে কেমন ক'রে বেঁচে আছি, এর চেয়ে আশ্চর্যতর প্রশ্ন বকরূপী ধর্মরাজও কল্পনা করতে পারতেন না। কৃমিসঙ্কুল নরকবাসও এই বিষচিন্তার কাছে স্বর্গ!

তারপর, এখন শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্ক। ভবিষ্যতের গর্ভে আর কি মারাত্মক গর্ভাঙ্ক আছে, স্বয়ং ঈশ্বরও হয় তো জানেন

না। তিনি তো সৃষ্টি ক'রে দিয়েই খালাস। সে সৃষ্টিতত্ত্বের আবিষ্কার ব্যাখ্যা ও বিড়ম্বনা সমালোচকের ও টীকাকার বৈজ্ঞানিকের হাতে। এখন দেখ্‌ছি 'এলার্জি' আর 'রী-এ্যাক্‌শ্যনের' পালা। ইতিমধ্যেই আমাদের কথাবার্তায় ভাব-ভঙ্গীতে পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। সাধারণ ভাষায় ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায এ দুটি বাক্যের এখন অবাধ প্রবেশ। কি রোগ-নির্ণয়ে, কি রাষ্ট্রতত্ত্বে, কি দাম্পত্য-নীতিতে, সর্বত্রই 'রী-এ্যাক্‌শ্যনের' জয়-জয়কার। আর সেই সব 'রী-এ্যাক্‌শান' অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ ক'রে আমরা যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচি, তাকেই 'এলার্জি' বলা হয়। এই 'এলার্জি' সকল শরীরেই নাকি অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু কতটা আছে এবং ব্যক্তিবিশেষে তার কি রকম প্রকাশ ও কার্য-কারিতা, সেটা এখনও গবেষণার সামগ্রী। ভেষজ-বিজ্ঞানে 'এলার্জি' হল 'ওয়ার্কিং হাইপথেসিস্‌' অর্থাৎ আনুমানিক সত্য। কিন্তু আনুমানিক বলেই এত বিতর্ক ও বিজ্ঞতার ভাণ এবং পাকাপাকি সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগেই এই আধসিদ্ধ আধ-পোড়া সত্যটির সন্ধানে শুধুই ডাক্তাররা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠ্‌ছেন না, আপনার আমার মতন নিরীহ কর্তব্যপরায়ণ আর শ্রদ্ধাভীরু মধ্যবিত্তকে খরচে আর দুশ্চিন্তায় প্রাণান্ত হতে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার গোলকধাঁধায় যখন হাঁপিয়ে উঠি, প্রকৃত রোগের নিদান খুঁজে না পেয়ে টক্কা-ফক্কা গোছের মনোভাব নিয়ে এলোপাথাড়ি ওষুধ কিনি, ইঞ্জেকশ্যন্‌ চালাই আর খাওয়ার অদল-বদল করি, তখন মনে হয়, ধুত্তোর

ঝক্‌মারি। এর আগেও অসুখ হত, পুরানো ব্যাধির চিকিৎসা যে হত না, তা নয়। প্যাথলজি আর এলার্জির অঞ্চল আশ্রয় না করেও অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের প্রশমন ও আরাম করতেন। এখন বৈশেষিক জ্ঞান-দর্শন আর কক্ষ-বিভক্ত শ্রম-বণ্টনের ফলে সমাজ-স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তো হচ্ছে এবং আরও ব্যাপকভাবে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ-প্রশ্ন জাগে—বিজ্ঞানের এলাকায় না ঢুকে মানুষ বাঁচে কি না। প্রকৃতি অথবা ঈশ্বর যে সুস্থ দেহ দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেইটে বাঁচিয়ে রাখা নিশ্চয়ই বড় কথা। কিন্তু তারই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে মশ্‌গুল হয়ে চিত্তবিভ্রমকারী উপসর্গের মৌলিক চরিত্র-বিশ্লেষণ কি আরও জরুরি তাগাদা? কোন্‌টা সহনীয়—অশক্ত দেহ, না অপ্রকৃতিস্থ স্নায়ু? শারীর-দৌর্বল্য না মস্তিষ্ক-বিকৃতি? বৈজ্ঞানিক যদি গবেষণাগারে তাঁর পরিশ্রম-সাধনা নিবদ্ধ রাখেন, তা হলে কারুর কোনও ক্ষতি নেই। বড় জোর আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ফরম্যুলা চুরি ক'রে আণবিক বিস্ফোরণ-রহস্য করায়ত্ত ক'রে নেয়। কিন্তু তাতে নিমেষে প্রলয়। সবাই একসঙ্গে ধ্বংস হয়। আর চিকিৎসকের গবেষণা যখন পরীক্ষা-স্তর পেরুতে না পেরুতেই কেমিস্ট ও ড্রগিস্ট অর্থাৎ ঔষধ-পথ্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে হাত মেলায়, তখন তার প্রত্যক্ষ ফলাফল ভুগতে হয় আমাদের প্রতিনিয়ত। মত বদ্‌লায়, ওষুধ পাল্‌টায়, দাম বাড়ে, কালোবাজার ফুলে ওঠে। অনিশ্চিত আরাম আর সুনিশ্চিত রোগ-ভোগের দোটানায় আমরা তিলে-

তিলে মরি। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমি নিত্য-মুমূর্ষু। দুশ্চিন্তায় আর লক্ষ্যভেদ চেষ্টায় কত যে খেসারত গুণে যাচ্ছি, তা বলবার নয়। তাই ভাবলাম, ভালো ক'রে মরবার আগে 'এলার্জি' আর 'প্যাথলজি'র শেষ প্রশস্তি রচনা ক'রে যাই।

একটা কথা আছে ধাত্ বুঝে বাত্। বে-কায়দা কাউকে কিছু বাত্লাতে গেলে কিল-ঘুঁষির আশঙ্কাই ষোল আনা। ধাত্ হ'ল লক্ষ্য করবার, বোঝবার জিনিস। আগে আগে দেখেছি ডাক্তার না হয়েও মা ছেলের ধাত্ বুঝতেন; চাকর মনিবের, ছাত্র শিক্ষকের আর স্ত্রী স্বামীর নাড়ী চিনতেন। কে কি পছন্দ করে, কোন্টায় চটে যায়, কোন্ জিনিস খেলেই অসুখ করে, কি দেখলে বা শুনলে মনটা ভাল থাকে—এটা জানতে হলে দরকার হয় চরিত্র জ্ঞানের। অর্থাৎ মনের চরিত্র, গঠন ও তার বিশেষ প্রকাশ-ভঙ্গী। এখন মনস্তত্ত্ববিদ্ আর ডাক্তার যন্ত্রপাতি নিয়ে এগিয়ে আসেন 'রেসপন্স্', 'রী-এ্যাক্শ্যন,' আর 'টেস্ট' করবার জন্যে। হয় তো কিছুটা হদিস্ মেলে। খাদ্য, বেশভূষা, রক্ত আর যাবতীয় পদার্থ একের পর একটি পরীক্ষা আর বিশ্লেষণ ক'রে দেহ-মনের অসুস্থতার মর্ম স্পর্শ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে কি হয়? বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তৃপ্ত হয়। সংখ্যাতত্ত্ব গড়ে ওঠে। আবার ভুল চিকিৎসাও হয়, মতবাদের একগুঁয়েমির ফলে। কিন্তু যথাযথ, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কি সব পুরানো ব্যাধি সারে? সারে না বলেই আমার বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যিনি ক্রনিক এ্যামিব্যাসিস, সোজা বাংলায় যাকে আমাশার নাড়ী

বলে, অথবা পুরানো হাঁপানি সম্পূর্ণ সারাতে পেরেছেন বলে দাবী করেন, তিনি মানুষ নন। নর-বেশে অশ্বিনীকুমার। এলার্জির মর্মমূলে প্রবেশ ক'রে খাদ্যাখাদ্যের বিচার ক'রে, অথবা সাময়িক ওষুধ খাইয়ে রোগের উৎকোপ কমান যায় নিশ্চয়ই। কিন্তু যেখানে অসুখের উৎপত্তি অর্থাৎ ধাত্, সেটিকে পরিবর্তন অথবা উৎপাটন কিছুই করা যায় না। যতই হাসপাতাল-ঘর করুন, দু'তিন বছর রোগটা চাপা থাকবে, এই পর্যন্ত। আবার ধরবে, যখন আপনি ধাতস্থ হবেন। পথ্য-নির্বাচন এবং কঠিন নির্দেশে দিনকয়েক আরোগ্যের আভাস। তারপর আবার যে-কে-সেই। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হবে বিরক্ত হয়ে। মনে হবে, এত কড়াকড়ি ধরপাকড় ক'রে শরীরটাকে টোট্যালিট্যারিয়ান রাষ্ট্র বানানোর চেয়ে মৃত্যুর নিশ্চিন্ততাই ভালো।

কিসে আপনার 'এলার্জি' এটা খুঁজে বার করা এক জীবনে কুলোয় না। আর সে খবরটা জেনে ফেলেই বা কি আপনার পরমার্থ লাভ হবে, সেটা ভেবে দেখেছেন? যদি বা এলার্জির একটা সূত্র-সন্ধান মেলে, জলবায়ু ও বয়সের গুণে ধাত্ বদলাতে যে পারে না, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারেন? তা হলে দেখা যাচ্ছে আমাদের শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে নিত্য টাগ্-অব্-ওয়ার চলেছে, তার জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত হয় একমাত্র মহানিদ্রায়। সারা দুনিয়াটা চলেছে ও ঝুলছে আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে। আপনার দেহটার মধ্যে যে এ্যানাবলিজম্ আর ক্যাটাবলিজম্-এর অফুরন্ত সংগ্রাম চলেছে, তার মধ্যে এলার্জির

স্থান ও গুরুত্ব কতখানি—এ সংবাদ জেনে উল্লসিত হয়ে ওঠার কোনও কারণ আছে কি? এলার্জি যে কি বস্তু, বর্ণনা ও ফলাফলের ব্যাখ্যা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তার স্বরূপের ডেফিনিশ্যন যদি আপনি এক কথায় জানতে চান, তা হলে বলি ব্রহ্মসূত্র অথবা অধ্যাস পড়ুন। পছন্দ না হয় তো আধুনিক কাব্যের সিম্‌বলিজম অথবা রূপকবাদের চর্চা করুন। কাব্য-রস ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর হলেও এলার্জির কাছে নিতান্তই ছেলেখেলা। যেন ধান্যেশ্বরীর জালার পাশে সোমরসের গণ্ডূষ।

থিওরির মারপ্যাঁচ আর তত্ত্বসাধনা আমার বরদাস্ত হয় না, এটা স্বীকার করছি। আর ফলিত প্রয়োগ-সিদ্ধিতেই জ্ঞানের সার্থকতা। ভয় এই যে, প্রয়োগটা আপনার আমার দেহের ওপর দিয়েই যায়, আর সিদ্ধি তো ফলেন পরিচীয়তে। এলার্জি সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনে আর পড়ে মনে হয়েছে যে, জগতের যাবতীয় রোগের ইকোয়েশ্যন যদি এলার্জি দিয়ে কষে ফেলা যায়, তা হলে বীজ-গণিতের বীজ মরে যাবে। সেই পরম দুর্লভ অজ্ঞাত 'এক্‌স্'কেই যদি হাতের মুঠোয় পাই, তা হলে দুয়ারে হাতী বেঁধে রাখা এমন কিছু কঠিন নয়। ঐ একটি সংখ্যাতত্ত্বের কৃপায় বীজাণু, অণু-পরমাণু সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ঘসা পয়সার মতন শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারি। কিন্তু রসিকতা যাক। এলার্জি কি না করে আর কোথায় গিয়ে না ঠেকে, সেই কথাটা ভেবে দেখুন। ধরুন, আপনার ছেলেটির শ্বাসকষ্টের পীড়া আছে। আপনি হোমিওপ্যাথি

এলোপ্যাথি, কব্‌রেজি সব রকমই করলেন। মাঝে মাঝে একটু কম পড়ে কিন্তু একেবারে সারে না। সম্পূর্ণ নিরাময় হচ্ছে না দেখে আপনি বুড়ী দিদিমার প্রেশকুপশ্যন-মত কলার মধ্যে আরশুলা পুরে খাওয়ালেন। কিছুই হল না। তখন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এলেন। রক্ত পরীক্ষায় ইয়োসিনো-ফিলের অনুপাত দেখে অ্যান্টি হিস্টামিন প্রভৃতি ঔষধপথ্যের বন্দোবস্ত করলেন, নানাবিধ ইঞ্জেক্‌শ্যন দিলেন এবং বলে গেলেন দই, ডিম, কাঁকড়া প্রভৃতি খাদ্য যেন ছেলে না খায়। ছ' সাত মাস ছেলেটি ভাল রইল, তারপর আবার শ্বাসের টান দেখা দিল। এবার আর একজন বিশেষজ্ঞ এসে নূতন ঔষধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। ঘটা ক'রে চিকিৎসা চলল। কিছুই হল না এবারও। তখন ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। বছর দু'য়েক স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে ডিম ও দই সেবন করেও ছেলে নিরাময় হল। তখন আপনার মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—এলার্জিটা কোথায় ও কোন খাদ্যবস্তুতে, তার গবেষণায় ছেলেটির দেহ-মন অকারণে পীড়িত ক'রে লাভটা কি হ'ল ?

আমি বলতে চাই না যে, এলার্জি ব্যাপারটা নিতান্তই ফক্কিকারি। শরীর থাকলেই ব্যাধি থাকবে, এবং ব্যক্তিবিশেষে ধাতের রকমফের হবেই। অতএব এলার্জিও আছে এবং বহুমুখী তার প্রকাশ। ধরুন, এক ব্যক্তি পশমের মোজা পরলেই তাঁর পায়ে চুলকানি দেখা দেয়। আর একজন ধোপার বাড়ী থেকে সদ্য ধুয়ে আসা জামা-কাপড় পরলেই

মাথাধরায় কষ্ট পান। অপর একজন ঝিনুকের বোতাম সহ্য করতে পারেন না। যে ব্যক্তি কাঁকড়ার দাঁড়া চুষতে ভাল বাসেন, চিংড়িমাছ খেলেই তাঁর ঠোঁট ফুলে ওঠে, মুখ চুলকায় ও গায়ে কি সব বেরোয়। বেলফুলের গন্ধে এক জনের কবিতা-ব্যাধি জেগে ওঠে, আবার সেই ব্যক্তিই গোলাপ নাকের কাছে ধরলে হাঁপানির টান অনুভব করেন। গমের রুটি খেলেই কারুর সাংঘাতিক অম্বল হয়, পুঁইডাটা কুঁচ চিংড়িতে আবার কারুর গায়ে একজিমা দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কোন্ দিক্ সামলাবেন! খাদ্য নিয়ে অফুরন্ত গবেষণা আর পরীক্ষা চালিয়ে যান, আপত্তি নেই। কিন্তু বিপত্তি আছে। অনেক ক্ষেত্রে তিতে বিপরীত হয়ে যায় অথবা স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। অতএব 'নেতি' 'নেতি' বলে এলার্জি-রহস্য সাধনায় উদ্দাম নৃত্যের কোনও সার্থকতা আছে কি? তা ছাড়া, শরীরের এলার্জি না হয় ধরা গেল। কিন্তু পাঁচ বছর অক্লান্ত সাধনা ও চূড়ান্ত খরচের পর শীতকালে বেগুন ভাজা অথবা বেগুন পোড়া না হয় আপনার খাদ্য তালিকা থেকে কাটাই গেল। কিন্তু ন' মণ তেল পুড়িয়ে একটি বেগুনের বোঁটা ধরতে পেরে এমন কি চতুর্বর্গ লাভ হল? এর চেয়ে কম খরচে মারণ-যজ্ঞ সেরে ভোট-যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ তোলা যায় আর স্বল্পতর পরিশ্রমে ব্রহ্মলাভ তো তুচ্ছ, ভগবানের টিকি বেঁধে রাখা যায়।

শুধুই কি দেহের এলার্জি! মানসিক এলার্জির প্রতীকার কি আবিষ্কৃত হয়েছে? যে ছেলে বই খুললেই ঢুলতে শুরু

করে, মার দিয়ে তাকে সারানো যায়? এক গ্লাস সোডা অথবা লেমনেড নিতে যাঁর হাত কাঁপতে থাকে, পুরো এক বোতল ব্রাণ্ডি খেয়েও তিনি এক পায়ে তর্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কি ক'রে? আবার খেলা-ধূলাতেও এলার্জি ঢুকেছে। হকিতে আমরা ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ন কিন্তু ক্রিকেটে কুপোকাৎ। বিলেতে গিয়ে আমাদের ব্যাটিং যে রকম নমুনা দেখাচ্ছে, তাতে মনে হয় যে-কোনও প্রকারের উইকেট্ সম্পর্কে আমাদের জাতীয় এলার্জি-রোগ ধরেছে। অন্য পানীয়ের পরিবর্তে যদি খেলোয়াড়দের সিরাপ বেনাড্রিল খাওয়ানো যায়, তা হলে হয় তো খেলা ঘুরে যেতে পারে। তারপর ধরুন, মিনিস্টেরিয়ল এলার্জি। আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলীর ধাত্ এমন যে সাত আটজন নিয়ে কাজ করতে গেলেই তাঁরা নিঃসঙ্গ, অসহায় বোধ করেন। উত্তেজিত হয়ে সব কাজ ভণ্ডুল ক'রে ফেলেন। ক্রমবর্ধমান ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যজেট আর ক্যাবিনেট না হলে তাঁদের কর্ম-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় না। কোনও মন্ত্রী সামান্যতম প্রতিবাদে ক্রোধার্ত হয়ে ওঠেন, কেউ বা বাম-কথাটি শোনা মাত্র মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। কেউ বা কমিটির বেড়াজালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, কারুর বা জনতা-ভীতি। কত আর উদাহরণ দেব?

সাংসারিক ও পারিবারিক এলার্জির কথা আর তুলব না। আপনারা তো ভুক্তভোগী। সারা দুপুর আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ঢুকলেই মাথা কি ভীষণভাবে ধরে, আর দু' দিন বাজারে যেতে না পেলে ঠাকুরের রান্না কি বিশ্রী

নুন-পোড়া হয়ে যায়, তা কি আপনারা প্রত্যক্ষ করেন নি? তবু দু'একটি কেস্‌-হিস্ট্রির উল্লেখ যদি না করি তা হলে আমার এ প্রসঙ্গের অবতারণাই নিষ্ফল হয়ে যায়। একটি সদ্য-পরিণীতা তরুণী স্বামী-গৃহে এসে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে বলা যায় না। অনেক দিন চিকিৎসায় যখন বাত-ব্যাধির উপশম হল, তখন শুরু হল মায়োকার্ডাইটিস্‌। বছর খানেক পরে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে যখন নবীন স্বামী কাশীবাস করালেন, তখন তাঁর হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিক নৃত্য-ছন্দ ফিরে পেল। এটা অবশ্য সাধারণ এলার্জি—যেমন উপরি-ওয়ালা উপরি না পেলে কথাই শুনতে পান না। দ্বিতীয় কেসটি নতুন ধরণের। এটিও মহিলা। প্রথম জীবনে এলার্জির ফলে তিনি সর্দি-কাশি আর চর্ম রোগে ভুগেছিলেন। তারপর কিছুকাল পরে এক নতুন উপসর্গ দেখা দিল। তার হাতের নোখের কোনগুলিতে ছোট্ট কালো চাঁদের মতন সরু সরু রেখা উঠল। ক্রমশ বড় হয়ে সেই অংশগুলি পচে যেতে লাগল। অবশ্য তারপর নতুন নখ গজাত। ডাক্তার এসে খুঁটিয়ে খবর নিলেন। মহিলাটি বল্‌লেন, 'তামা-কাঁসা, পেতল ধাতুর জিনিস ব্যবহার করলে এই রকম হয়।' ধাত্‌ বদ্‌লাবার জন্যে ধাতু বদ্‌লানো হল। স্বামী বিত্তবান্‌। তাই সোনা-রূপায় শরীর ও ঘর মুড়ে দিলেন। বছর খানেক পরে, রোগ অদৃশ্য হল। কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি না জানি না। তবে ডাক্তার বললেন, 'এলার্জির ধাতুরূপ'। তার স্বামী বললেন, 'মেটালার্জি'। তৃতীয় কেস্‌টি মজার। রোগিণী

আমার বন্ধুপত্নী। কিছুদিন আগে আমার বন্ধুটি অত্যন্ত বিমর্ষভাবে আমাকে জানালেন যে, তাঁর স্ত্রী দিন দিন কেমন যেন অলস, অন্যমনস্ক ও নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছেন। কিছুই ভালো লাগে না। গৃহস্থালীর কাজ, সেলাই কর্ম করতে গেলেই অসম্ভব মাথার ও চোখের কষ্ট। চোখ দেখানো হয়েছে, চশমাও নেওয়া হয়েছে। কিছুতেই সারছে না। কেবল যে দিন সিনেমা কিংবা থিয়েটার যাওয়া হয়, সে দিন কষ্ট থাকে না। তাই সপ্তাহে এখন দু'বার ক'রে ছবিঘর এবং রঙ্গমহল যেতে হচ্ছে। খরচ বেড়ে যাচ্ছে, এখন কি করা যায়। ডাক্তার না হয়েও আমি আরোগ্য ক'রে দিয়েছি। এই হল চিকিৎসা পত্র ঃ—সকালে নুন-চা, বিকালে মরিচ-গুঁড়ো শোঁকা, সন্ধ্যায় থকৃথকে এক বাটি সাগুদানা আর যদি রাতের শো হয়, তবে আগে থাকতে দু'টি গার্ডেন্যাল বড়ি এক সঙ্গে সেবন। আপনারা প্রয়োজনমত প্রয়োগ ক'রে দেখবেন।

অফুরন্ত এই এলার্জি-রহস্য। প্রকৃতির মায়া-লীলাও অনন্ত। সে তুলনায় কতটুকুই বা পুরুষের বিজ্ঞতা আর ডাক্তারি অভিজ্ঞতা।

বই বাজার

হায় চুয়ান্ন !

তের শো চুয়ান্ন সাল পর্যন্ত বইয়ের বাজারের যে অবস্থা ছিল আর আজ সেই বাজারের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে মনে হয় আমরা মস্ত বড় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে এসে পড়েছি। গত মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তর মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল বটে, কিন্তু বই নিয়ে টানাটানি করে নি। শেয়ার মার্কেটের চড়তি দরের মতন বইয়ের বাজার ছিল গরম অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের যে কোনো অনায়াস প্রসবের সমাদরের অভাব হত না। বাজারে তার কাটতি হতই। কিন্তু এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো। বই ভালোই হোক অথবা তার ব্যবসায়িক মূল্য যতই থাকুক, প্রকাশকেরা আর এগুতে ভরসা পাচ্ছেন না। কেউ বা স্পষ্ট সত্য কথা প্রকাশ ক'রে বলেন, কেউ বা বইয়ের ব্যবসায় মন্দা পড়েছে দেখে ছাপাখানার কাজের দিকে মন দিচ্ছেন বেশি। পাঠকের দল কিছুটা নির্বিকার, লেখকের দল ক্ষুণ্ণ এবং বিভ্রান্ত।

দু-এক বছর আগে থেকেই কিন্তু আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তখন পাঠক, লেখক আর প্রকাশক ঢেউয়ের চূড়ায় বসেছিলেন। তরঙ্গভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আর আসন্ন দুর্দিনের ছবিটা তখনও যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। আর্থিক সাফল্য আর আত্মিক কৃতিত্বের সুলভ

অদূরদৃষ্টির বাষ্পান্ধতা ঘটেছিল। বই লেখা, তাকে চটপট বাজারে ছাড়া আর সে বই কেনার গোলকধাঁধায় পড়ে লেখক পাঠক প্রকাশকের চিত্তবিভ্রম হয়েছিল। চারদিকে তখন কাঁচা টাকার ছড়াছড়ি। যে উপায়েই হোক্, পয়সা তখন ঢুকেছিল পকেটে এবং সে পয়সা খরচ করবার একটা জায়গা চাই। তাই বইয়ের ব্যবসা। কিন্তু এরি মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞ কারবারী, তারা বুঝেছিলেন সাধু তুলসীদাসের সংকর্কবাণী। তাই কেউ কেউ সময় থাকতে হাত গুটিয়েছিলেন। কিছুটা মূলধন হস্তান্তরিত ক'রে, বাকী পুঁজিটুকু কাঠের বা জমির বা অন্য যে কোন ক্ষতি-ভয়-হীন কারবারে লাগিয়েছিলেন। এঁরা অবিশ্যি ভুঁইফোঁড় পুস্তক-ব্যবসায়ী। বেনো জলের মতন হঠাৎ সাহিত্যের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিলেন আবার কমতি স্রোতের টানে যা কিছু হোক্ সঞ্চয় ক'রে নিয়ে মাঠ-ঘাট নালা-নর্দমা ভেঙ্গে বড় দরিয়ার বৃহত্তর সম্ভাবনায় গিয়ে পড়েছিলেন। এঁদের কথা বলছি না। বইয়ের বাজারে যেটুকু লাভ, সেটুকু সাময়িক। সেটা তাদের মুষ্টিগত হয়েছিল। আর যেটুকু ক্ষতি, সেটুকুর তাল সামলাচ্ছেন লেখক-সম্প্রদায়, তাঁদের করতলের মায়াফল হল বিষফল।

গত পাঁচ ছয় বছরে যে হরেক রকমের বই বাজারে বেরিয়েছিল, বিষয়বস্তু অনুসারে যদি তাদের একটা নির্ঘণ্ট তৈরী করা যেত, তা হলে বোঝা যেত দেশের যুদ্ধকালীন অবস্থার ভিতরকার চেহারা। সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে তা হলে পেতুম দেশের সংস্কৃতিসমাজের একটা মোটামুটি ছক্, লেখকের রচনার

আর পাঠকের চাহিদার একটা মাননিরূপণ-চিত্র। সেই প্রসঙ্গে বুঝতে পারতুম, লেখনী আর মুদ্রাযন্ত্রের অবৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় বর্তমানের সাহিত্যিক মান বিভ্রম সম্ভব হল কেমন ক'রে। আরও বুঝতুম বইয়ের বাজারে সাম্প্রতিক অচল অবস্থাটা সাহিত্য-নিয়তির চক্রাবর্তন নয়, অর্থনীতিরই চক্রান্ত মাত্র।

বেপরোয়া নীতি

বেশিদিন আগেকার কথা নয়, এমনকি গত বৎসরে এই সময়ে যদি কোনও সকালে পথেঘাটে দশজন আলাপীর সঙ্গে দেখা হ'ত, তা হলে শুনতে পেতুম অন্ততঃ জনচারেক নতুন কাগজ বার করছেন, দু'জন 'পাব্লিকেশ্যন' লাইনে ঝুঁকেছেন আর বাকী চারজন সর্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকাবিশেষের প্রথম ও শেষ প্রকাশ শারদীয়া সংখ্যার উপকরণ অর্থাৎ রচনা এবং ক্যাপিটাল সংগ্রহ বা সন্ধানের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। যদিও অর্থনৈতিক চাপে বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন সুপিষ্ট এবং লেখক-পাঠকদের অধিকাংশই 'মাগ্‌গি ভাতা'র অধিকার বঞ্চিত তবুও বইয়ের চাহিদা ছিল। অন্ততঃ যুদ্ধ-পর্বকালের বাজারের চেয়ে যুদ্ধকালীন এবং সমরোত্তর যুগের বইয়ের বাজারের অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে ভালো ছিল। বাজারে যে এত বই আর কাগজের ছড়াছড়ি ছিল, তার একটা অর্থনৈতিক কারণ আর ব্যবসায়িক মূল্য ছিল নিশ্চয়ই। লোকসংখ্যার আধিক্যই হোক আর মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থ প্রাচুর্যই হোক বিজ্ঞাপনের বাজার-কল্যাণে কাগজ আর বইয়ের কাটতি হয়েছিল বেশি। দেখা যাচ্ছিল, যে জিনিস ছাপা অক্ষরে বাজারে বেরোয় তা

আব পড়ে থাকে না। কেন না সাধারণ পাঠক গল্প-উপন্যাস তো পড়ছেই—তা মৌলিক হোক আর অনুবাদ-সাহিত্যই হোক, এমন কি প্রবন্ধও পড়ছে, বিজ্ঞান এবং বিবিধ বিষয়ের বইও পড়ছে, শুধু তাই নয়, বই কিনে পড়ছে। সুতরাং যুদ্ধের সময়ে কিংবা যুদ্ধেব অব্যবহিত পরেই যে সব কাববারী লোক নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁবা এই মোকায় কিছু পুঁজি বাজাবে ছাড়লেন। মধুলোভী মক্ষিকার মতন অনেক অসাহিত্যিক এসে জুটলেন। ফলে একটি ঘর একটি ভাড়াটে ছাপাখানা, আর কাগজের 'পারমিট' অথবা কালো-বাজারী কৌশলে অপরেব কাগজের 'কোটা' ক্রয় ক'রে নিয়ে গোড়াপত্তন হল। কোনও প্রকাশনী বিপণির অজস্র বাজে বই বেরুতে লাগল নিরুদ্দেশনীতির উদ্দেশমূলক প্রেরণায়। টাকা তো উঠে এলই, লাভও হতে লাগল। এমন কি ছাপাখানার মোটা অঙ্কের বিলগুলো যথাসময়ে মেটানো সম্ভব হল আর আশ্চর্যের বিষয় লেখকসজ্ঘও কিছুটা লাভবান হলেন। গাড়ী-বাড়ী-ফোনে আপাত-সমৃদ্ধ না হলেও অনেক সাহিত্যিকই এই সময়টাতে অঙ্গে বিলিতি আদ্দি অথবা আমেরিকান ক্যাম্‌ব্রিক চড়িয়েছিলেন! কফি হাউসে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছিলেন এবং সময়ে অসময়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জরুরি ব্যবসার তাগিদে ওঠবার সময়ে ৯৯৯নং গোল্ড টিপের টিনটা খুলে ধরেছিলেন হতবাক্ বন্ধুদের সামনে। বর্তমানে আবার সব পুনর্মূষিক। সাময়িক সামরিক সাহিত্যিক সৌভাগ্যের শিখর অনেকটা আকস্মিক ধ্বসে যাওয়ার ফলে,

ঘাঁটিগুলোতে তেমন আর ভিড় জমে না। বিজ্ঞাপনের তথা পুস্তক-পত্রিকার বাজার অসম্ভব খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তা। ছাপাখানাগুলিতে 'ওভারটাইম' খাটুনির কাজ বন্ধ হয়েছে, দপ্তরীর দল অবসর সময়ে ঘুড়ী বানাচ্ছে। নতুন বই নেওয়া তো দূরের কথা, পুরানো চালু বইয়ের ঘাটতি হলেও দ্বিতীয় সংস্করণ হচ্ছে না। তাই লেখকরা চারদিকে ছাঁটকাটের বহর দেখে 'নেভি কাটে' নেমেছেন। সাহিত্য-যানের এক্সপ্রেস এখন মালগাড়ী। তাই স্টেট এক্সপ্রেস এখন অচল। তবে ন্যাশনাল স্টেট, এই যা। হয়তো ভবিষ্যতের ভরসা!

ইন্‌ফ্লেশ্যন!

এ রকম সঙ্কটময় পরিস্থিতির অবিশ্যি একাধিক কারণ রয়েছে। অর্থনৈতিক গুহ্যতত্ব ইন্‌ফ্লেশ্যনের অন্ধকার গুহাতেই নিহিত। ডলারের অদৃশ্য সূত্রে কাগজের দর আর বহির্বাণিজ্যের আমদানির সঙ্গে স্বদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের অভাব কি নিগূঢ় আকর্ষণে ঝুলছে, সেটা হয়তো সকলের বোধগম্য নয়। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা আর শ্রমিক সমস্যা নিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভ পূরণ আর লেখকবর্গের হা-হুতাশ চলে, এই পর্যন্ত। কিন্তু এসব ছাড়া আরও অন্য কারণ রয়েছে, যেগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এলাকাতেই পড়ে। সেগুলি হল স্থূল ও বাস্তব কারণ, যাদের জের এখনও মেটেনি। তাদের প্রতিক্রিয়া এখনও চলেছে।

অর্থনৈতিক কারণগুলি মোটামুটি পূর্বেই উল্লেখ করা

হয়েছে। বিশ্বব্যাপী তুর্দিনে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, খাদ্য সমস্যায়, সামাজিক বিপর্যয়ে যখন সকল দেশের সকল মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত, তখন বইয়ের বাজারের অচল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা সাজে না। অতিরিক্ত মূল্য দিয়েও যখন জীবনধারণ তুর্বিষহ, নিত্য উপকরণের অনেক জিনিসই তুষ্প্রাপ্য, তখন বই বার করা কিংবা বই কেনা বিলাসিতা মাত্র। এইটাই হয়তো সাধারণ জনমত। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা চলে, যে সব দেশে গত মহাযুদ্ধের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া চলেছিল, সেখানেও যুদ্ধাবসানে বইয়ের ব্যবসা অচল হয়ে যায়নি। বাজে কাগজেও বই ছাপা হয়, সে বই বিক্রী হয় এবং লোকে বই পড়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধকালীন লাভটুকু নিয়েছিলেন মহাজন, কিন্তু যুদ্ধাবসানে তাঁরা ক্ষেত্রান্তরে বিচরণ করছেন যেহেতু এঁরা প্রকৃত পুস্তক-ব্যবসায়ী নন। আর যাঁরা পুরানো প্রকাশক, তাঁরা বাজারের হাল-চাল দেখে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। হবারই কথা। তবে ভবিষ্যতের আশা নিয়েই তাঁদের টিকে থাক্‌তে হবে।

দাঙ্গা

পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা যে কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—সেটা হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বৎসরাবধি কাল এই মহানগরীর প্রেতদশা ঘটেছিল। যে সব অঞ্চলে বইয়ের দোকান সে দিক্‌টা দিনের বেলাতেও জনশূন্য থাকৃত। মধ্যে মধ্যে বিপক্ষের ঘাঁটি পেরিয়ে যদি বা শিবিরে প্রবেশ করা যেত, ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসার তুর্ভাবনায় কোনও

কাজ করার মত মানসিক স্থৈর্য্য সে সময়ে সম্ভব ছিল না। অপর পক্ষে দপ্তরীপাড়ার মুসলমান কর্মীবা পেটের দায়েও হিন্দু এলাকায় যাতায়াত করতে ভরসা পেত না। উপরন্তু ছাপাখানার কাজ অচল হয়ে পড়েছিল। যান-বাহন এবং রাস্তা-ঘাটে স্বাভাবিক চলাচলেব অসুবিধায় শতকবা আশি-জন লোক কাজ কামাই করতে বাধ্য হত। কম্পোজিটর, মেসিনম্যান, মিস্ত্রি, দপ্তরীর দল যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে প্রকাশকের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। যদি বা বই বেরুল, কিনবার লোক নেই। মানে, বইয়ের দোকান অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে বন্ধ থাক্‌ত। কোনো কোনো প্রকাশকের দোকান এমন জায়গায় অবস্থিত, যেখানে ব্যবসা চলে না। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ফলাফল এতই সাম্প্রতিক ঘটনা যে বিশদ ক'রে বলার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লেখকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি, এতো লোকসানেব মধ্যে এটুকুই যা লাভের ও আনন্দেব।

আসল কথা—মন ভালো না থাকলে লেখা যায় না এবং লেখার ব্যবসাও জমে না। সাহিত্য সম্বন্ধে অন্ততঃ এই একটি কথা বলা চলে যে, বিনা আড্ডায় এর সৃষ্টি হয় না। ইঁদুরের গর্তে অন্ধকাবের মধ্যে বাস ক'রে দিনের পর দিন কাটানো ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। দেশের ওপর দিয়ে যে অত বড় বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারীর তাণ্ডবলীলা হয়ে গেল তা'তে সাহিত্যিকরা যথেষ্ট পরিমাণে বিচলিত হলেও, তাঁদের লেখা থামেনি। বরঞ্চ উদ্‌বুদ্ধ সমাজচেতনায়

তাঁদের লেখনী এই ভয়াবহ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নতুন প্রশ্নাকুল প্রেরণা সঞ্চয় করেছিল। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লব থেকে শুরু ক'রে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যতই প্রতিকূল ঝড়ের সৃষ্টি করুক, সাহিত্য রচনার আর পুস্তক প্রকাশের পরিপন্থী হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি লেখক ও প্রকাশকের পথ এমনিভাবে রুদ্ধ করেছিল যে, আজও সে মানসিক সুস্থতা ফিরে আসে নি। এমন পরিবেশে বইয়ের বাজার যে খারাপ হয়ে যাবে, সেটা বিচিত্র নয়। সমাজ ও অর্থনীতির অবনতি-ক্ষণে মানসিক অবদমন অনিবার্য।

বঙ্গ ভঙ্গ

এ ছাড়া, আরেকটি বড় কারণ আছে যেটা বইয়ের ব্যবসাকে সব চেয়ে বড় ঘা' দিয়েছে। বঙ্গ-ভঙ্গ লেখক-প্রকাশকের মেরুদণ্ড ভঙ্গ করেছে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেও বই ও কাগজের বাজারে যে তোড়জোড় দেখেছিলুম, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যে প্রকাশ উদ্যম এবং উৎসাহের অভাব ঘটেনি, আজ সে সব একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে। পার্টিশানের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল লেখকরা জানতেন। বুঝেছিলেন বাঙালী সংস্কৃতির পূর্ণ এবং অখণ্ড বিকাশে এইবারে মস্ত বড় ফাটল ধরবে। আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকগুলি এমন একটা প্রাচীর গড়ে তুলবে যেটা নিকট-স্বার্থে প্রণোদিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের হয়তো অনুকূল, কিন্তু সমাজ-চেতনা এবং সাহিত্য-বৃত্তির পক্ষে ঘোরতর অন্তরায়। এরি ফলে বাংলা বইয়ের সব চেয়ে বড় মার্কেট পূর্ব পাকিস্থান বিদেশ হয়ে গেল। সেই সূত্রে বই বেচাকেনার ব্যবসা বন্ধ

হতে বসেছে। মানসিক অসহায়তা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অস্তিত্ব যেখানে প্রকট, সেখানে বই কিনে পড়া একটা বিলাসিতা বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। খাঁটি পশ্চিম বঙ্গীয় বাসিন্দা হলেও এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, কলকাতা শহরের বাদ দিলে বইয়ের মার্কেট নেই বললেই চলে। রুক্ষ অনুর্বর দেশে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হলেও তার জীয়ন-রস পূর্ববঙ্গের পলিমাটিতে, তার সম্পদে ও প্রাচুর্যে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী সম্মেলন করে, সাহিত্য-আলোচনা করে, আড্ডা জমায়। পূর্ববঙ্গের লোক বাংলা সংস্কৃতির জন্মকেন্দ্র থেকে দূরে আছে বলেই নাড়ীর টান অনুভব করে বেশি। সাহিত্য নিয়ে তার আন্তরিক উত্তেজনা। শুধু হুজুগ নয়, ফ্যাশনমাফিক সস্তা মতবাদও নয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বই পড়ে এবং সব চেয়ে দরকারি কথা—ধার ক'রে নয়, পয়সা দিয়ে কিনে। বাংলা দেশের পাঠক-সংখ্যার তিন ভাগ হ'ল পূর্ববঙ্গে, সিকি ভাগ হ'ল পশ্চিমবঙ্গে। শিক্ষায়তন, শিক্ষিত লোক আর লাইব্রেরিগুলির সংখ্যা গণনা করলেই দেখা যাবে অবিভক্ত বাংলাদেশে বইয়ের বাজার চালু রেখেছিল কারা। সেই বাজার যদি অবস্থা-বিপর্যয়ে বন্ধ হবার জোগাড় হয়, সেটা বিচিত্র নয়। চিন্তারই কথা।

ইউনাইটেড ফ্রণ্ট

যে কারণগুলির উল্লেখ ক'রে বর্তমান বইয়ের ব্যবসার অচল অবস্থার বর্ণনা দেওয়া গেল, সেগুলি লেখক ও প্রকাশকরা জানেন এবং নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছেন। তবু প্রতিকূল অবস্থার

মধ্য দিয়ে বাঁচতে হলে চাই নতুন উপায় উদ্ভাবন, চাই নতুন পরিকল্পনা এবং আর্থনীতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু প্রয়োগ। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে যেটুকু ক্ষীণ স্রোত এখনও আছে সেটুকু আবদ্ধ থেকে থেকে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাবে। যুদ্ধ-কালীন লাভালাভের খেলো উত্তেজনা সরে গিয়েছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দ্বন্দ্বেরও যা হোক্ একটা নিরসন হয়েছে। এখনও এ অচল অবস্থা আর কত দিন স্থায়ী হবে, সেই ভেবে মুহ্যমান হলেই শুধু চলবে না। সমরোত্তর যুগের যেটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সেটা বন্যা-বিধ্বস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার মতই স্বাভাবিক। তবু যারা বেঁচে রইল তাদেরই উদ্ধার-কল্পে কর্ম-নীতির প্রয়োজন আছে। যেটুকু আছে, সেটুকু দিয়েই কাজ চালাতে হবে। যুদ্ধের বাজারে অর্থের যে বিশেষ অর্থ ছিল মুদ্রাস্ফীতির যুগে তার অর্থান্তর ঘটেছে। খরচ বেড়েছে, আয় নেই। তবু যুদ্ধাবসানে আর্থ-নীতিক ওলট-পালট হলেও কিছু পাঠক তো এখনও আছে। তাদের পাঠ-স্পৃহা এবং বই পড়ার অভ্যাস এখনও আছে বলেই মনে হয়। এ দুর্দিনে ঐটুকুই আমাদের মস্ত লাভ। ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিভক্ত দেশেও যদি পাঠকদের উপর আস্থা রেখে লেখক-প্রকাশকেরা পারস্পরিক উদাসীনতা ও শিথিলতা বর্জন ক'রে পরিকল্পিত সহযোগিতায় আবার কাজ শুরু করেন, তা হলে কিছু সুরাহা হতে পারে।

মধ্যস্থতা

ঘরে ও বাইরে যদি আমাদের আচরণ সম্বন্ধে নিজেরা সচেতন থাকতুম, তা হলে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে দাঁড়াত। অকারণ মতান্তর ও মনান্তরের সৃষ্টি হত না।

কিন্তু সাংসারিক আর সামাজিক জীবনে, আমাদের কাজে ও চিন্তায় অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, যে গুলির সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি সজাগ নই। আবার এই গলদগুলো এতই সাধারণ, আমাদের দিনানুদৈনিক কর্মে ও আচরণে তারা বর্ণচোরার মত মিশে আছে যে, অনেক সময়ে প্রথম নজরে ধরাই পড়ে না। আর যখন ভালো ক'রে ঠাহর ক'রে দেখি তখন সেই সব ত্রুটির গুরুত্ব আমাদের অভ্যস্ত দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাদের হাস্যকর অসঙ্গতি আর লঘু কৌতুক-চরিত্রটাই চোখে পড়ে বেশী। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অসংশোধিত থেকে যায় এবং অসতর্ক মুহূর্তে অহেতুক অসন্তোষ এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। হস্তক্ষেপ করা, অর্থাৎ সকল কথায় কথা বলা কিংবা পরের কাজে অনাবশ্যক মাথা ঘামানো, এমনি একটি অতিসাধারণ ত্রুটি আমাদের হাব-ভাবে কথাবার্তায় নিত্য নিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ সেই হস্তক্ষেপের ফলাফল সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগী নই। এমন কি তৃতীয় ব্যক্তি যদি আমাদের এই স্বভাবদোষটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তা হলে আমরা

অসন্তুষ্ট হয়ে উঠি, হয়তো বা রীতিমত বিরক্ত হই। আমরা শুধু অপরের ব্যবহার ও কাজ নিয়ে মন্তব্য করেই খালাস। অপরে সে কাজ করলে আমরা ঘোরতর অপছন্দ করি, সহজে তাকে রেহাই দিই না।

ব্যাপারটির মজা হল এইখানে। পরের কাজে ও কথায় বাধা দেওয়া, অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করা এমনি একটা মজ্জাগত স্বভাব ও মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যায় যে, অনেক সময়ে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না কি করছি। লোকে যেমন ঘুমিয়ে বলে ঘুমাইনি, খেয়ে বলে খাইনি, এও অনেকটা সেই ধরণের। একবার এই মোড়লি করার মতন বদ অভ্যাসের পাল্লায় পড়লে ওর কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। একটু একটু ক'রে সেই প্রবৃত্তি সঞ্চিত ও বর্ধিত হতে থাকে। এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন এই ধরণের হস্তক্ষেপকারী মানুষের অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য শুধুই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে না, বিভীষিকারও সৃষ্টি করে। তাই নিরীহ আত্মীয় প্রতিবেশীর জীবন দুর্বিষহ ক'রে তোলার চাইতে সময় থাকতে সাবধান ও সচেতন হওয়াই ভালো।

আপনার সত্যিকারের হিতৈষী যদি ও যখন আপনারই মঙ্গল কামনায় আপনার চরিত্রের কোন ত্রুটির উল্লেখ করেন, তা হলে এবং তখন অসহিষ্ণু না হয়ে আপনার সেটা মেনে নেওয়াই উচিত। স্থির মুহূর্তে যদি একটু আত্মবিশ্লেষণ ক'রে দেখেন, তা হলে বুঝতে পারবেন এটা কি বিশ্রী অভ্যাস। অপরের অযাচিত উপদেশে আর গায়ে পড়া অন্তরঙ্গতায়

যদি আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তা হলে আপনার অকারণ হিতৈষণায় অথবা নিঃস্বার্থ মধ্যবর্তিতায় অপরের কি রকম খারাপ লাগে, সেটা আপনার বোধগম্য হওয়া উচিত। অন্ততঃ যাতে বোধগম্য হয়, সে চেষ্টা করা আপনাদের অবশ্য-কর্তব্য সামাজিক দায়িত্ব। যদি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেন যে, রাজা বিনা রাজ্য বেশ চলে যায় এবং বিনা হস্তক্ষেপে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর প্রকৃতির অমোঘ অনুশাসন বিন্দু-মাত্রও ব্যহত হয় না, তা হলে আপনারই মানষিক শান্তি, আমাদের আর কি বলুন? আপনারই নিকটস্থ আর পাঁচজন মানুষ সুস্থ হৃৎপিণ্ড নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে, আপনাকে 'বোর' বা 'টের‍্যর' বলে সমাজে এড়িয়ে যাবে না—এইটুকুই লাভ।

বস্তুতঃ অনেকেই জানেন না এবং ভাবতেও পারেন না যে, তাঁদের মাত্র শারীরিক উপস্থিতিটাই কি রকম আড়ষ্ট ভাব ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মোড়লি কাজটা অনেক রকমের হয় কি না। তাই এর ব্যবহারিক প্রয়োগে নানা প্রকার সূক্ষ্ম শিল্পকৌশলের অবকাশ আছে। কেউ হলেন নীরব কর্মী। অর্থাৎ বেশি বাক্য-ব্যয় না ক'রে এঁরা দুটি একটি প্রাণঘাতক মন্তব্যেই কাজ সমাপ্ত করেন। এঁদের কর্মনীতি হল কূর্ম-নীতি অর্থাৎ নিজেকে গুটিয়ে রেখে অপরের প্রতিটি কাজ ও কথা সমালোচনার দৃষ্টিতে অনুধাবন করা। এ যেন খানিকটা 'প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স'—নীরবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। এই শ্রেণীর মানুষ অযথা চেঁচামেচি বা খিট্‌খিট্ করেন না।

শুধু হাবে-ভাবে সমস্তক্ষণই নিজেদের অপছন্দ এবং অমত জাহির করেন। অথচ সোজাসুজি যদি এঁদের প্রশ্ন করা যায়, 'আচ্ছা, এ বিষয়ে আপনার মতামতটা কি?' তা হলে এঁরা কখনোই সেটা পরিষ্কার ক'রে বলতে চান না। খোলসা মন এঁদের বড় একটা হয় না। বরঞ্চ কেমন যেন একটু আড়বুঝের মতন তেরছা জবাব দেন, 'তবু ভাল যে জিগ্যেস করেছো। কিন্তু আমার কাছে আবার পরামর্শ নিতে আস কেন? আমি কি-ই বা বুঝি আর জানি যে মত দেব?'

অথচ কাছে থেকে, হয় তো বা একই সংসারে বাস ক'রে এঁরা এমন শীতল, শিথিল, উদাসীন এবং নির্বিকার সেজে বেড়ান যে আপনি মনে মনে এঁদের অপ্রীতিভাজন হলেও ঠিক বুঝতে পারবেন না যে, আপনার কৃতকর্মের ফল কল্যাণকর, না কি তাতে সর্বনাশের সম্ভবনা ঘনিয়ে আসছে। আহত অভিমান পোষণ ক'রে যে সব আত্মীয় প্রতিবেশী সর্বদাই মুখ ঘুরিয়ে থাকেন, তাঁদের অনুক্ত বক্তব্যের নৈতিক চাপটা নিতান্ত কম নয়। কেন না, আপনার মনে এমন একটা অস্বস্তির চাপা গুমোট অহরহ অশান্তি বহন ক'রে আনে যে, মনে হয় —এর চেয়ে সরল ভাষায় বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করাটাই ছিল ভালো। এই ধরণের এড়িয়ে যাওয়া ব্যবহার কিছু না বলার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই বলতে চায়। এও এক রকম হস্তক্ষেপ, পরোক্ষ ভাবে বাধা দেওয়া। তাই এক হিসেবে গূঢ় মন্তব্য, অকথিত উপদেশ আর তির্যক্ শ্লেষ খোলাখুলি মোড়লির চেয়ে অনেক বেশি

অপ্রীতিকর ঠেকে। আপনার চিন্তা ও কর্মের অভ্যস্ত মসৃণ গতি প্রতি পদেই তার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলে মধ্যবর্তী এক মানুষের অদৃশ্য তর্জনীসঙ্কেতে। তাঁর অর্ধ-মুদ্রিত দৃষ্টির স্তিমিত প্রয়োগে, বিলীয়মান হাস্য রেখার অনুকম্পায় অথবা তাচ্ছিল্যে আপনার মন সুস্থ ও সহজ থাকতে পারে না।

আর একদল লোক আছেন যাঁরা সমস্তক্ষণ খিট্‌খিট্‌ করেন, পিছু পিছু ঘুরে বেড়ান এবং বেশির ভাগ সময়ে কাজে সাহায্য না ক'রে কাজ পণ্ড ক'রে দেন। ধ্বংসমূলক সমালোচনায় আর সঘোষ শিক্ষাদানেই এঁদের পারমার্থিক আনন্দ ও তৃপ্তি। পরিচিত মানুষ অকৃতকার্য হলেই এঁদের মানসিক স্ফূর্তি। অমানুষিক উল্লাস উত্তেজনায় পরিণত হয়। কেন না এঁরা জানতেন—বহু আগে থেকেই জানতেন যে, ঠিক এমনটি দাঁড়াবে ; কথা না শোনার ফল হাতেনাতে ভুগতেই হবে। গৃহস্থালীর ব্যাপারেই হোক আর পড়াশুনার ব্যাপারেই হোক, এঁদের প্রতিভা সর্বকর্মপটীয়সী। ঘর পরিষ্কার, জিনিস পত্র গুছিয়ে রাখা থেকে শুরু ক'রে সংসারের যাবতীয় কাজে এঁদের নির্ভুল হস্তক্ষেপ। এঁদের দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যজ্ঞান সাধারণতঃ অসাধারণই হয়ে থাকে এবং এঁদের প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞতা এতই ব্যাপক এবং অতলস্পর্শী যে, আপনার-আমার মতন মূঢ় ব্যক্তির পক্ষে তার বিস্তার এবং গভীর সত্যতা অনুমান করা দুঃসাধ্য।

আপনার প্রতিটি প্রয়োজনীয় অথবা অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি-

গত কাজে এঁরা সশব্দ পদসঞ্চারে উৎসাহভরে এগিয়ে আসেন। বই কেনা থেকে শুরু ক'রে রেলের টিকিট কাটা আর নিরাপদ স্থানে টাকা খাটানো থেকে আরম্ভ ক'রে দরকারি দরখাস্ত কিংবা মূল্যবান দলিলের খসড়া তৈরি করার কাজ পর্যন্ত সকল বিষয়েই এঁরা সমান পারদর্শী। আর তার চেয়ে বড় কথা—এঁদের অদম্য উৎসাহ। কিছুতেই তাঁদের হঠানো বা দাবানো যায় না। আপনার বলিষ্ঠতম প্রতিবাদ এদের বাক্য-স্রোতে ভেসে যায়। মধ্যবর্তী হিতৈষীর অনর্থক চেষ্টায় ও উপদেশে আপনি নিছক শারীরিক ক্লান্তির বশেই অসহায় বোধ করবেন, শেষ পর্যন্ত নিজেকে তাঁর হাতে কিছুটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। তাঁর বাগ্‌বাহুল্যে আপনার ব্যয়-বাহুল্য হোক, তাঁর নির্ভুল সংবাদে ও নির্দেশে আপনি পাত্র-আশীর্বাদের জন্য বৈষ্ণবাটিতে না পৌঁছে কামারকুণ্ডুতে গিয়ে দুক্রোশ মেঠো রাস্তা ভাঙুন, তাঁর অতিরিক্ত গোছানোর ফলে আপনার ইন্‌সিওরেন্স পলিসি খানি নিখোঁজ হয়ে যাক্, তাঁর অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রে আপনি লোকসান দিন ব্যবসায়ে, তাঁর তদ্বির-কার্যে আশ্বাসবান্ হয়ে তাঁরই বিশিষ্ট পদস্থ আত্মীয়ের কাছে চাকরীর উমেদারী করতে গিয়ে আপনি অপমানিত হয়ে ফিরে আসুন, কিংবা তাঁর প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আস্থা রেখে সামান্য অসুখে আপনি এক ঘোরতর চিকিৎসা সঙ্কটের সৃষ্টি ক'রে অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হোন, তাতে কিছু আসে যায় না। পরামর্শ তিনি দেবেন, হস্তক্ষেপ তিনি করবেনই। প্রচণ্ড তাঁর আত্ম-বিশ্বাস, অটুট তাঁর পরোপকার

নিষ্ঠা, অকাট্য তাঁর তর্কপ্রিয় যুক্তিবত্তা। অপরের মোড়লি আর অযাচিত উপদেশে আপনার প্রাণটা যখন কণ্ঠাগত, তখন যা হয় হোক্‌গে—এই রকম একটা মরিয়া ভাব নিযে আপনাকে হাল ছেড়ে দিতেই হবে। তখন পরম তৃপ্তির স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে তিনি সেই হাল শক্ত হাতে ধরে নেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই নিপুণ কর্ণধার অত্যধিক হুঁসিয়ারির ফলে আপনাকে ঘুর্ণি-জলে নিয়ে গিযে ফেলেন। নাকানি-চোবানি খেয়ে ও খাইয়ে অতঃপর হালখানি আপনার কম্পমান ও মজ্জমান হতে ছেড়ে দেন। এই ধবণেব লোক যে সব সময়ে খারাপ মানুষ হন, তা নয়। জেরোম্-কে-জেরোম্-বর্ণিত সাইকেল মেরামতকারী মানুষটিব কথা একবার ভেবে দেখুন। অনেক দুর্গতির সৃষ্টি বরলেও এঁদেব মধ্যে কখনও কখনও সহজ চমৎকাবিত্ব লক্ষ্য কবা যায়। তবে এঁদের অন্যান্য সদ্‌গুণ সব চাপা পড়ে যায় মধ্যস্থতা করবার দুর্নিবাব আকাঙ্ক্ষায়, হস্তক্ষেপের জন্য অদম্য হস্তকণ্ডুয়নে।

এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁদের চিনিয়ে দিতে হয় না, বিজ্ঞাপনেরও প্রয়োজন নেই। পাড়ায় সকলেই তাঁদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা জানে। এঁরা হলেন প্রকাশ্য মোড়ল। গ্রাম্য পঞ্চায়েত্ হোক আর পাড়ার রোয়াকই হোক্ হরিসভায় হোক্ আর ওয়ার্ডের নির্বাচন কেন্দ্রেই হোক্, এঁদের অধিষ্ঠান, কর্মদক্ষতা এবং স্থানীয় প্রভাব সর্বজনবিদিত। বিপদে-আপদে এঁরা এগিয়ে আসেন, পরের বাড়ীর কাজে বুক দিয়ে পড়ে পরিশ্রম করেন। সংকটে এঁদের সালিশী মানা

হয়, আড়ালে তাঁদের যে বিশেষণেই ভূষিত করা হোক্ না কেন। মোড়লি আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু এমন কায়দায় এমন একটি বিশিষ্ট আসন তাঁরা দখল ক'রে নিয়েছেন যে, তাঁদের না ডেকে ও না মেনে উপায় নেই। সর্বজনীন উৎসবে চাঁদা তুলতে এঁরা যেমন ওস্তাদ, আবার কাজ ভাগ ক'রে দিয়ে নিজে মুরুব্বি সেজে হাঁক ডাক করতেও তেমনি নিপুণ। নিজ নিজ পল্লীতে এঁরা শিব-মন্দিরের মতই অটল ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কোনও একটা সভা-সমিতি গড়ে তুলতে তাঁরা যেমন পারেন তেমনি আবার দলাদলি ক'রে কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিতেও জানেন। বেচারা বিস্‌মার্ক শুধু জ্যর্মনিকেই তৈরি করেছিলেন। তিনি জানতেন না যে বাঙ্গলা দেশে তাঁরও চেয়ে ঘুণ অনেক 'ভিলেজ বিসমার্ক' আছে, যারা তাঁকে রাজনীতির প্যাঁচ শেখতে পারে। বাংলা দেশের সমাজনীতি আর রাজনীতির ব্যাকরণ বড় কড়া জিনিস। এখানে গড়ার আগে মোড়লি ক'রে ভাঙ্গার কাজ শিখতে হয়, সতর্ক হস্তক্ষেপে মুষ্টি দৃঢ় ক'রে বাগিয়ে নিতে হয়। বহু ঘাটের জল খেয়ে, দালালি আর মোড়লি ক'রে বহু মানুষের অর্থ-প্রচেষ্টা ডুবিয়ে দিয়ে যে যত বদ্‌নাম কেনে, সে তত পাকা লোক। জেনে শুনেও অপরে তাকে ভয়-ভক্তি করে।

কিন্তু সে কথা থাক্। সচরাচর লক্ষ্য করি, হস্তক্ষেপ কাজটা যথার চেয়ে অযথাই বেশি হয়ে থাকে। যখন যথার্থ প্রয়োজন তখন হস্তক্ষেপ না করাটাই অন্যায়। যেখানে অমঙ্গল ও ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল এবং নিশ্চিত, সেখানে অপ্রীতিকর দায়িত্ব এবং

কর্তব্যপালনে পরাঙ্‌মুখতা বড় রকমের ত্রুটি। যেখানে বিশিষ্ট বন্ধু বা আত্মীয়ের স্বার্থহানির সমূহ সম্ভাবনা, যেখানে অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতায় পারিবারিক অথবা সামাজিক অকল্যাণ, সেখানে বাধ্য হয়েই নৈতিক কর্তৃত্ব অথবা অধিকার প্রয়োগ করতে হয়। সংসার, সমাজ ও জাতির মঙ্গল-কামনায় যে হস্তক্ষেপ অথবা বিপ্লব-প্রচেষ্টার প্রয়োজন ঘটে, তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ের প্রশ্ন ওঠে না। স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধে মন দ্বিধাগ্রস্ত হলেও বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণরক্ষায় গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্র-নেতাকে অনেক সময় হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে কোনও জটিল সমস্যার সমাধান-কল্পে।

কিন্তু মধ্যস্থতা যেখানে অনাবশ্যক, তখন সেটা অযথা,—নিতান্তই ব্যক্তিগত মানসিক মুদ্রাদোষ। ঘরোয়া জীবনে কিংবা সমাজ-সম্পর্কে এই মধ্যস্থতা-প্রবৃত্তির এতো অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে যে, তাদের হিসাব-নিকাশ করতে বসলে ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। সহস্রভাবে ও উপায়ে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্রিয়ায়, অজ্ঞাতসারে এবং সচেতন মনোভাবে, আমরা পরস্পরের কর্ম আর চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রে চলেছি। অপরের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সঙ্কুচিত, আয়ত্ত করবার চেষ্টায় নানা কৌশলের প্রয়োগ ক'রে চলেছি। উদ্দেশ্য, আত্ম-প্রতিষ্ঠা। কারণ, কর্তৃত্ব এবং অধিকার-বোধের প্রেরণা। উপলক্ষ্য, দৃশ্য অথবা অদৃশ্য কোনও ত্রুটি। ফল, পরহিতব্রত পালনের গভীর তৃপ্তি। লাভ, নিজের। লোকসান, অপরের—যিনি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ণপাত করেছিলেন। আমরা

যারা পরের কথায় কথা বলি, সংসারের এবং সমাজের কাল্পনিক বিশৃঙ্খলার কথা ভেবে অনাবশ্যক দুশ্চিন্তায় পীড়িত হই আর সুবিধা পেলেই হস্তক্ষেপ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, আমরা মোটেই খেয়াল করি না যে, পরামর্শের চাপে আর মধ্যস্থতার আতিশয্যে আসল কাজটাই ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা অতি-সাধারণ উদাহরণ দিই ঘরোয়া জীবন থেকে।

যে ছেলের পিছনে বাপ-মা অথবা শিক্ষক অনবরত লেগে আছেন, তার প্রত্যেক কাজে নীতি-উপদেশ দিতে থাকেন, সামান্য বয়সোচিত ত্রুটিগুলোকে অপরাধের সামিল বিবেচনা ক'রে বার বার বিরক্তিকর আলোচনা চালান, তার জামা-কাপড়, খাওয়া-শোওয়া, লেখা-পড়ার খুটিনাটিতে সমস্তক্ষণ কড়া নজর দেন নয়তো অনাবশ্যক সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, সে ছেলের স্বাবলম্বন-শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তার অবসর কোথায়? অযথা হস্তক্ষেপের ফলে সে কি শুধু বাপ-মায়ের ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা ও সংস্কারের প্রতিফলন হয়ে থাকবে? পরবর্তী জীবনে তার প্রতিক্রিয়াটা কোন্ পথে যাবে, সেটা ভাববার ধৈর্য অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না।

যে স্বামী গৃহস্থালীর কাজে, খরচ-পত্র লোক-লৌকিকতার ব্যাপারে, আসবাব ভাঁড়ার আর বাজারের তদন্ত-হিসাবে অনবরত চোখ রাখেন, তিনি তো অত্যাচারী স্বামী। সংসার ও স্ত্রী—দু'টি পদার্থকেই সমগোত্র নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ড ভেবে, নিজস্ব অধিকার প্রয়োগে স্ত্রীর সামান্য সত্তাটুকুও গ্রাস ক'রে

বসেন। অবিচারটা কোথায় হচ্ছে এবং তার ফল কি, সেটা চিন্তা ক'রে দেখার অবসর থাকলেও উদারতা নেই।

(যে স্ত্রী স্বামীর ব্যক্তিগত অভ্যাস আর স্বভাবের সংস্কার-সাধনায় তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজে নিপুণ সম্মার্জনী চালিয়ে যান,—অর্থাৎ স্বামী কখন কি করবেন, খাবেন-শোবেন, বেড়াবেন-ফিরবেন, দৈনিক ক'টি সিগ্রেট সেবন করবেন আর দৈনিক কতটুকু হাতখরচ করবেন—এ সমস্তই নির্ভুল ছকের মধ্যে বেঁধে ফেলে স্বামীকে মালিকানা স্বত্ববোধে অঙ্কলগ্ন ক'রে নেন, তিনি যতই নিঃস্বার্থ গৃহিণীপনার অজুহাত দেখান না কেন, আসলে তিনি অপরিণামদর্শী, স্বার্থপর মানুষ। ভ্রুকুটিল গাম্ভীর্যে আর নারীত্বের সুলভ শাসনপদ্ধতিতে তিনি যদি ক্রমাগত স্বামীর পৃথক্ ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে চলেন, তা হলে নিরীহ প্রাণীও একদিন দড়ি ছিঁড়ে পালাবেই।)

যে শিক্ষক ছাত্রের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা এবং কৌতূহল দমিয়ে দিয়ে শাসন আর ভয়ের বেড়াজালে তার উদ্ভিন্ন সুকুমার মনটিকে বেঁধে ফেলেন, সে যা পড়তে ও বুঝতে চায়—তাতেই বাধা দিয়ে নিজের কল্পিত রুটিন-মাহাত্ম্য আর নিয়ম-নির্দেশকেই অভ্রান্ত সত্য মনে করেন, সে ছাত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর যে মনিব ভৃত্যের কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রতি-পদেই তাকে শিক্ষা দিতে থাকেন, সে অচিরেই সরে পড়বে। অফিসে, শিক্ষায়তনে কিংবা অন্য কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি-বর্জিত নির্মম উদাসীনতা, ছিদ্রান্বেষণ অথবা অযথা হস্তক্ষেপের ফলে কি বিশ্রী অবস্থা দাঁড়ায়, আন্তরিক সহযোগিতা

এবং স্বাধীন কর্ম-স্পৃহার অভাবে কাজ কি রকম নষ্ট হতে থাকে, সে খবর সবাই রাখেন। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের সামাজিক সম্পর্কের মধুরতা এই কারণে ও এইভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। মহিলাদেরও নিজস্ব সাংসারিক সম্বন্ধটা এই কারণেই তিক্ত এবং কটু হয়ে দাঁড়ায়। শাশুড়ী, জা অথবা ননদ যখন দরদ দেখিয়ে অথবা আপনার অশিক্ষিত পটুত্বের বিজ্ঞাপন জাহির করবার তাগিদে বধূর হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে অবশেষে সেটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত, বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলে চলে যান, তখন কি রকম লাগে—ভুক্তভোগিনী মাত্রেই সেটা অনুমান ক'রে নেবেন।

মজা এই যে, যিনি যত বেশি হস্তক্ষেপ করেন, তিনি তত বড়াই করেন—যে ঐ কাজটা তিনি কোনও দিনই করতে পারেন না এবং করা পছন্দও করেন না। আসলে এই মধ্যস্থতা একটা রোগ-বিশেষ; আধি এবং ব্যাধি। ভদ্র প্রতিবাদে এর প্রতিকার নেই।

ঘরোয়া

সম্প্রতি আমার জন্মদিন গেল। ঘটনাটা এমন কিছু ঘোরালো নয় যে ঘটা ক'রে তার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে হবে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মতই ব্যাপারটা নিতান্তই সাধারণ। তবু বিষয় ব্যক্তিগত হলেও, তার মধ্যে এমন এক একটি আবেদন থাকতে পারে যা বাইরের মনকে কাছে টানে, চিন্তার আত্মীয়তায় সখ্য-সূত্রের সন্ধান দেয়। এমন ঘটনা তো হামেশাই আমাদের জীবনে আসছে ও যাচ্ছে। এবং তা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা জল্পনা-কল্পনা ক'রে থাকেন। আমিও করেছি এবং একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে যে কথাগুলো আমার মনে উদয় হয়েছে, তাই লিখছি। প্রসঙ্গটা বক্তব্যের তুলনায় হয়তো কিছু অবান্তর আর ভাবনাগুলোও এমন কিছু সূক্ষ্ম নয়, বরঞ্চ স্থূলই। তবু আপনারা ভেবে দেখবেন, ভাবের অনুবেদন জাগে কিনা মনে।

বকরূপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং?' যুধিষ্ঠির প্রাণ-সংশয় উপস্থিত জেনেও যথাযথ সমস্যা পূরণ করেছিলেন। ধ্রুব মরণ-সত্যের সম্মুখীন হয়েও মানুষের এই আপন জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত বিশ্বাসই তাঁকে সব চেয়ে নাকি বিস্মিত করেছিল। আমি তত্ত্বজ্ঞ নই। প্রাণহানির আশঙ্কা এখনও দূরে। তবু মনোভাবটা মহাভারতীয় হয়ে উঠছে কেন বলতে পারি না। মনে

হচ্ছে, জীবন-যৌবন অন্তর্হিত হতে দেখেও তাদের আঁকড়ে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াসের মত আশ্চর্য আর কিছু নেই।

শুনেছি বাঙালী সন্তান যতই বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল এবং নাস্তিক হোক না কেন, চল্লিশের পরই গীতা পাঠ ও ঠাকুর প্রণাম ধাতস্থ হয়ে আসে। এ নাকি হতেই হবে। হয় বেদান্ত নয় বৈষ্ণব-দর্শন। তেলে-জলে আর মাছে-ভাতে যেমন বাঙালীর দেহ-পুষ্টি, মন্ত্র-মাহাত্ম্যে আর গুরু-সংগ্রহে তেমনি তার মনস্তুষ্টি। যৌবনে যিনি যতই চার্বাক-পন্থী হোন্, প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে পৌঁছুলে মুখে তার ততই জন্মান্তর আর কর্মফলের রহস্য-কীর্তন।

মাড়োয়ার থেকে কত নিরীহ কিশোর এসে ওঠে বড় বাজারে আত্মীয়ের গদীতে। ব্যবসার সূক্ষ্ম কসরৎ শিখে ফেলে দু'চার বছরেই। তারপর জাব্‌দা খাতা, ঝুরো ব্যবসা আর পাগ্‌ড়ি মাকড়ি খুলে চাপায় গলাবন্ধ কোট, কেনে হালফ্যাশনের গাড়ী, খেলে তেজী-মন্দার ফাট্‌কা, পোষে মেয়েমানুষ। আটা-ময়দায় বেলে পাথর-কুচি আর তেল-ঘিয়ে ভেজাল মিশিয়ে রাতারাতি দু'চারটে কোম্পানীতে লালবাতি জ্বালিয়ে, গদীতে গনেশ উল্‌টিয়ে লালদীঘির পাড়ে গিয়ে জমায় কেতা-দুরস্ত অফিস। কংগ্রেসী ফণ্ডে চাঁদা দেয়, সরকারকে তোষণ-মন্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে করে কার্যোদ্ধার। চল্লিশেই অত্যাচারে জর্জর দেহ নিয়ে যায় পুষ্করে কিংবা বদ্‌রি-কেদারে। বানায় তীর্থ-যাত্রীর ঘাট, তোলে ধরমশালা।

বাঙালীর ছেলে অতটা কেরামতি না দেখালেও, একেবারে

তুর-ছাই নয়। হিম্মৎ না থাকলেও এলেম আছে, একথা মানতেই হবে। মুফতে মুনাফার ওপর তার স্বাভাবিক আসক্তি। ঘুষেই হোক্ আর পুশ্-এই হোক্, অনেকেই দু'চার পয়সা কামিয়ে নেন সময় থাকতে। যাঁরা জুয়া বা রেস্ খেলেন না, তাঁরা সংসারের জুড়ি হাঁকিয়ে চলেন কোনো মতে। অর্থাৎ বাবুয়ানি না ক'রে, পয়সা না উড়িয়ে সঞ্চয় ক'রে চলেন। পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়ে যা উদ্‌বৃত্ত থাকে, তাই দিয়েই চালিয়ে নেন। সরকারী মোটা পেন্সন্ থাকলে তো কথাই নেই। সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় হিন্দু মহাসভার সপ্রশংস আলোচনা ক'রে আর বাড়ী ফিরে বরাদ্দ দুধ-রুটি গিলে 'গুরোর্নামৈব কেবলং' বলতে বলতে গৃহিণীর পাশেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মলিন শয্যা নেন। এর পর আর কি আশ্চর্য আছে, বলুন!

আমার অদৃষ্টে কোনও সুখই নেই, সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে, ধেমো গয়লার মতন আশি বছরেও, আমি সাবালক হতে পারব না। মধ্য প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছুলুম। উত্তর চল্লিশের বন্দনায় মুখর হতে পারছি না, কেননা এ বয়সের প্রাপ্য ও কাম্য দৈহিক আরাম, অর্থ স্বচ্ছলতা অথবা মানসিক নিশ্চিতি, কোনটাই আজও করতলগত হল না। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তা হবেও না। যদিও আমি আপনাদের মতই মধ্যবিত্ত, জীবনের মধ্যস্থল পার হয়ে এসেছি, তবু বিত্তের কোনও নাগালই পাইনে। মাঝখান থেকে অকারণ চিত্তে অপ্রসাদ ঘনিয়ে ওঠে। তবে নেতাদের যে আশার বাণী শুনিয়েছেন, তাতে কু-তার্কিক সমালোচক হয়েও মনটা

কেমন যেন ভিজে-ভিজে ফুলো হয়ে উঠেছে। একটা ক্ষীণ ভরসা হচ্ছে যে, তাঁদের দেওয়া মধ্যবিত্তের ডেফিনিশ্যন্ অনুসারে যদি পাঁচ লাখী না হয়েও পঞ্চাশ হাজারী মন্সবদার হতে পারি, তাহ'লে ফৌজদারী মামলা এড়িয়ে দাওয়ানীর কেরামতিটা সামনের পাঁচ বছরে কি শিখে ফেলতে পারব না? কিমাশ্চর্যা-মতঃপরং?

এই পর্যন্ত লিখে ভালো ক'রে তলিয়ে দেখলাম—পারব না। মানে অত দুসাহস নেই। নির্বোধ, নিষ্কাম শিক্ষক বলেই সমাজ এখনও সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, একটা মিথ্যে সম্মানের ঠুন্কো বেদীতে বসিয়ে দিয়েছে। ঠুঁটো জগন্নাথের মত তাই বসে আছি। হঠাৎ লাফ দিয়ে ঝাঁপ দেবার মতন হিম্মৎ কিংবা ঝোপ বুঝে কোপ্ মারার আর্ট আয়ত্ত করতে পারব না। সোজা কথা বলে ফেলাই ভালো। আমার ধর্ম-জ্ঞান হয়নি আজও, মানে সেই দিব্য জ্ঞান যার ফলে ওপর-ওয়ালা দেনে-ওয়ালার কৃপা বর্ষিত হয়। বয়স ভাঁটিয়ে এসেছে। এদিকে অবলাকে ভুলিয়ে তার গচ্ছিত ধন অথবা নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কৌশল কিংবা দেশ সেবার অছিলায় জনগণের কল্যাণে দু-চারটে প্রতিষ্ঠান ফেল ক'রে দেবার বিদ্যাবুদ্ধি আমার নিরেট্ মস্তিষ্কে ঢুকবে না।

সমাজে আর রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকবার দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, যাঁর যত কেলেঙ্কারি, তাঁর ততই প্রতিষ্ঠা। সাধারণ নীতি-জ্ঞানটুকু কানা মূলধন ক'রে আপনি আমি এমন কি লাভবান্ হয়েছি? আমরা যে মহাপুরুষ, এমন কথা বলি না। ছোট-

খাট মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অন্যায়, স্বার্থ-সন্ধান হয়তো নিত্যই ক'রে চলেছি। কিন্তু বৃহৎ ভণ্ডামি, মহৎ ধূর্ততা, বিশাল শঠতার তুরীয় ক্ষমতা আমাদেব নেই। এটা যে মস্ত কিছু কৃতিত্ব, সেটা বলছি না। তবে অত স্ট্রেন, সাহস বা ঝুঁকি নেবার যোগ্যতা যে কুষ্ঠিতে লেখেনি, এইটুকুই স্বীকার করছি। বড়ত্বের প্রতি গোপন ঈর্ষ্যা অথচ কর্মের অসঙ্গতি! এটা বিস্ময় নয়?

ওদিকে আবার বার্দ্ধক্যের জয়গান করতেও মন সরে না। আসল কথা, মনটা আমার স্থূল জড়বাদে আচ্ছন্ন। যে বয়সে এসে পৌঁছুলাম, তাতে অনায়াসে গোষ্ঠীপতি অথবা সমাজপতি হয়ে ত্রি-সন্ধ্যা পালন করা চলে। আগে যে যে সভায় বা মজলিসে যেতাম, সেখানে বয়সে ছোট বলে পেছনে বসে সিগ্‌রেট খেতাম। এখন যেখানেই যাই, ছেলে-ছোকরার দল একটু অভ্যর্থনা জানিয়ে সরে পড়ে। নিজেই ভাবতে পারি না, যৌবন ভাঁটিয়ে এসেছে এবং দু'পাঁচ বছর পরেই উত্তর প্রৌঢ়ত্বে উত্তীর্ণ হব। মানি, আমার বয়সে আমার পিতৃ-পিতামহ বৃহৎ সংসারের কর্ণধার ছিলেন, অন্ততঃ গুটিকয়েক দৌহিত্রের মুখ দেখেছিলেন। আমারই কয়েকটি বাল্যবন্ধু ইতিমধ্যে একাধিক জামাতা বরণ করেছেন। অল্পবয়সে বিবাহ করলে পিতৃত্ব পদ লাভ করা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু ও বিষয়ে আমি 'হ্যাণ্ডি ক্যাপ্‌ড' এবং তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করি না।

পুত্র-কন্যার উপার্জ্জন ও সেবা ভোগ করতে পারব না বলে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছি না। বরঞ্চ, দেরিতে সংসার পাত্‌লেও জীবনটা একটু বেশি দিন তাজা থাকে, এই আমার

ধারণা ও অভিজ্ঞতা। আপনাদের কি অভিমত জানি না। তবে আমার মনে হয় যৌবনে পদার্পণ ক'রে বিবাহ করার চেয়ে পূর্ণ যৌবনে পরিণত দেহে ও মনে দাম্পত্য জীবন শুরু করা বোধ হয় সঙ্গত ও সমীচীন। যাঁরা তিরিশে জীবন শুরু করেছেন, পঞ্চাশ পর্যন্ত তাঁদের মনে রঙ থাকে যদি স্বাস্থ্যটা মোটামুটি সতেজ হয়। বিলেতের কথা হচ্ছে না, যেখানে পঞ্চাশেও মানুষ নবীন থাকে। এ দেশেই বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। আমি শুধু দেহের কথা বলছি না। কেন না, আঠারোতে প্রথম বিবাহ আর আটষট্টিতে তৃতীয় দার-গ্রহণ ক'রে সত্তরে নবজাতক কোলে ক'রে বৃদ্ধকে গদগদ হতে দেখেছি স্বচক্ষে। নিয়মের ব্যতিক্রম আছে জানি। কিন্তু আমি ইঙ্গিত করছি মনের সজীবতা—যেটা থাকলে পঞ্চাশেও জীবন-তরণী লঘুমি স্রোতে একটানা ভেসে চলে, আর যার অভাবে চল্লিশেও পাকা মাঝি হাল ছেড়ে দিয়ে দাম্পত্যের ফুটো নৌকা অল্প বাতাসেই বান্‌চাল ক'রে ফেলে।

খোলাখুলি ভাবেই লিখ্‌ছি। ব্যক্তিগত ভঙ্গিমায় আমার বক্তব্যের কদর্থ করবেন না। ঘরোয়া ব্যাপার প্রকাশ্যে আলোচনা করা অনেকে হয়তো পছন্দ করেন না। কিন্তু ঘর যদি বাঁধা না থাকে, অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনের ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয়, তা হলে সে ঘর ভেঙ্গে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়। তখন তো দুর্ভাগ্য নিয়ে প্রকাশ্যে বিলাপ করা চলে! সময় থাকতে, সদ্‌ বিবেচনায় যদি যৌথ জীবন সুন্দর ক'রে গড়ে তোলা যায়, দেহের ও মনের সামঞ্জস্য-বিধানে ঘরের খুঁটি শক্ত

ক'রে বাঁধা যায়, তাহ'লে ভবিষ্যতে সুখের নীড় যে-কোন হাওয়ায় উড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না—'মনে ছিল আশা'... বলে বৃথা আক্ষেপ করার দরকারও হয় না। এই খানেই আমার পুরানো প্রতিপাদ্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলে বাল্য-বিবাহের মধ্য দিয়ে যৌথ জীবন ও দাম্পত্য প্রণয় গাঢ় হয়ে উঠত। তারপর প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই সাংসারিকতার জালে উভয়ে এমন জড়িত হয়ে যেতেন, সমাজ-ধর্ম ও সংস্কারের বাধ্যতামূলক আচরণে এমন ভাবে লিপ্ত হতেন, যে স্বামী-স্ত্রীর দেহ-মনের দাবি-দাওয়া আপনা থেকেই ছক্-কাটা জীবনে নিজের একটুখানি সঙ্কীর্ণ ও গোপন আসন রচনা ক'রে নিত। তাই নিয়ে উভয়ে অকারণ মাথা ঘামাতেন না।

তা ছাড়া, সে যুগে বহু বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক প্রথা ছিল যেগুলো অবাঞ্ছনীয় হলেও মেনে নেওয়া হত। এক কথায়, পুরুষ-প্রধান সামাজিক ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের স্থান, প্রয়োজন এবং দাবি ছিল সঙ্কীর্ণ, সুনির্দিষ্ট। জীবনে যতই পঙ্কিলতা থাকুক, পুরুষ হলে তা ধামাচাপা দিয়ে রাখা হত। স্ত্রৈণ হয়েও কেউ বা আড়ালে হতেন ঝৈন। গোষ্ঠীপতি বেশি বয়সেও ঠাকুর-ঘরে ব্যাভিচার ক'রে পার পেয়ে যেতেন আর অল্পবয়সী যুবক ঘরের বিধুমুখীকে সন্তুষ্ট রেখে বাইরে ঘোরাঘুরি করতেন। কারুর বা তাঁতি বৌ অপবাদ, কারুর বা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই অবৈধ সম্পর্ক চলত। স্ত্রীরা দেখেও দেখতেন না। প্রতিপত্তি থাকলে, সমাজও চোখ ঠেরে মুখ বন্ধ রাখত। গোলক চাটুজ্যে নিছক্ কাল্পনিক চরিত্র নয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের গোপন

অভিসার দূরে থাকুক্, আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে নির্দোষতম আলাপ-পরিহাসটুকুও সংসার ও সমাজ ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে দেখত। তাই যে পরিবেশে অপরিণত বিবাহ, সংসার ও দাম্পত্য জীবনের অনুশাসনে জমি-জমা, এক কাঁড়ি ছেলে-মেয়ে, পারিবারিক দায়িত্ব এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চল্লিশেই তার সার্থক পরিণতিতে এসে পৌঁছুত, সে পরিবেশ এখন নেই। তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, যুক্তিযুক্ত নয়। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবন কত বদ্‌লেছে, সেটা ভেবে দেখলেই এ উক্তির সহজ সত্য বোঝা যায়।

বর্তমানে উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে বিবাহিত হতে চললে আমরা মন্তব্য ক'রে থাকি, 'নিজেই এখনো কাছা সামলাতে শিখ্‌ল না; তায় গাঁটছড়া বাঁধ্‌তে যাচ্ছে।' আর মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। প্রভাত মুখুয্যে মশাইয়ের উপন্যাসে চৌদ্দ বছরের মেয়ে দিব্বি পাকা কথা বলে, মনের মানুষ চিনতে শেখে। শরৎ বাবুর অপরিণীতা ললিতা যে সুনিপুণ গৃহিণীপনা আর সূক্ষ্ম মনস্তত্বের অধিকারিণী, দেখলে আপশোষ হয় কেন দু' যুগ আগে জন্মে ললিতার প্রেমে পড়ি নি। কিন্তু দেহে নারীত্বের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছুলেও, আজকাল তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়েকে খুকি ছাড়া অন্য চোখে দেখতে আমরা জানি না অথবা পারি না। ফ্রক ছেড়ে যতই অপটু হস্তে শাড়ী-বিন্যাস আর যুবতী-সুলভ প্রসাধন চলুক, কোনও বাইশ তেইশ বছরের যুবক অমন একটি মেয়ের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেছেন, এ কথা কল্পনা করতেও পারবো না। এটা ভালো

কি মন্দ, সে কথা উঠছে না। যুগ-পরিবর্তনের ফলে দাম্পত্য জীবনের মান-পরিবর্তন হয়েছে। নানা স্থূল তথ্য বর্তমান গার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শ-নিয়ম, প্রত্যাশা ও পূরণ-ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বদ্‌লে দিয়েছে।

দেহের ও মনের সুসঙ্গতিটাই হল আসল কথা। এক মত, এক বৃত্তি, এক ধারা থাকলেই সুখ ; অথবা স্বাতন্ত্র্য, স্ব-নির্ভরতা থাকলে অসুখ—বয়স কাছাকাছি হলে মনের মিল ও সখ্য ভাব আর বয়সের একটু বেশি তারতম্য থাক্‌লেই গরমিল আর অশান্তি—এমন কতকগুলো সাধারণ সিদ্ধান্ত খাড়া করা চলে না। (প্রতি স্ত্রী-পুরুষের দেহ-মন, গঠন আর জীবনের দাবি বাঁধা খাতে প্রবাহিত হয় না। নিয়ম আছে, তার ব্যতিক্রমও আছে। তবু মোটামুটি বলা চলে, ঘরোয়া সুখের গোড়ার কথা হল ঘর। সেটি পৃথক ও স্বতন্ত্র হলে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরিণত চিত্তে, যৌথ পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা থেকে কিছু দূরে, স্বাধীন ও মনোমত পরিবেশে আপনাদের শারীরিক ও মানসিক সামঞ্জস্য রচনা ক'রে নেবার পূর্ণ সুযোগ পান। তখন আশা থাকে, ঘর পাকা হবে। কাঁচা বয়সে মন যতই তৈরি থাকুক্, সেটা অকাল-পক্ব। ফলে প্রৌঢ়ত্বের কিনারায় আসতে না আসতেই সংসারের চাপ জাঁতাকলের মতন চেপে ধরে। প্রথম বিবাহিত জীবনের বৈধ উচ্ছৃঙ্খলতা কাটিয়ে বীতস্পৃহ, অনাসক্ত পুরুষ মনে করে—সব ফুরিয়ে গেছে। উভয়ের জীবন ও যৌবনের তখন ধুলায় গড়াগড়ি। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, অল্প বয়সে বিবাহের ফলে দু'জন দু'দিকে মুখ

ফিরিয়েছেন। অবৈধ প্রণয়ের সান্ত্বনা খুঁজেছেন উভয়েই। ঘর ভেঙেছে, ছেলে মেয়েরা ভেসেছে। সাংসারিক পবিত্রতায় কদর্যতার ছাপ পড়েছে, যদিও বাইরে থেকে পারস্পরিক বিশ্বাস-প্রীতির বড় বড় ফাটলগুলো মেরামত করবার হাস্যকর বিড়ম্বনা চলতে থাকে।

এক ভদ্রলোকের কথা জানি, যাঁর পিতামহ নাত-বৌয়ের মুখ দেখার অধীর আগ্রহে পুত্র ও পুত্রবধূর অনিচ্ছায় একমাত্র পৌত্রের বিবাহ দেন কুড়ি না পেরোতেই। প্রথম পাঁচ বছরের ইতিহাস ছিল অলক্ষ্যে। কিন্তু দশ বছর কাট্‌তে না কাটতেই ব্যাপারটা বিশ্রী ভাবে প্রকট হয়ে উঠ্‌ল। অর্থাৎ ত্রিশ বছরেই ভদ্রলোকেব অভাবনীয় পরিবর্তন হল। আট বছরের একটি ছেলে কিন্তু তাব ওপর কোনও পিতৃত্ব-সূচক স্নেহ-মনোভাব জন্মাতে দেখলাম না। ভদ্রলোকের বাপ-মাই সংসার চালাতেন, ছেলে মানুষ করবার দায়িত্ব নিয়ে মানুষ করতে পারলেন না। নাতিটি চোদ্দ বছরেই লায়েক হয়ে উঠ্‌ল। মিথ্যা ও জোচ্চ রিতে ঐ বয়সেই এমন পাকা হয়ে উঠল যে সমস্যার কথা। ভদ্রলোকের স্ত্রী নিরীহ ও নির্বোধ। স্বামীর মন বীতরাগ দেখে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অথবা তাঁর ইচ্ছা ও প্রত্যাশা মাফিক আপনাকে তৈরি করা—কোনটাই তাঁর ধাতস্থ হল না। ভদ্রলোক আসেন-যান, অর্থ রোজগারের চেষ্টায় বাইরে বাইরেই ঘোরেন। শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ। চরিত্র-স্খলন তাঁর হয় নি। কিন্তু ঘটনার জটিল চক্রে তিনি কোন্ পথে ঝুঁকবেন, তা অনুমান করেছিলাম। বাপ-মা

উভয়েই গত হলেন। দিন কয়েক এল বৈরাগ্য। একমাত্র ছেলেটি ষোল না পেরোতেই উচ্ছন্ন যাবার দাখিল। স্ত্রী নিস্পৃহ, অ-সংস্কৃত, উদাসীন। হল তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব। আপনার চেয়ে বারো চৌদ্দ বছরের ছোট, সুশ্রী ও শিক্ষিত একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সংসার ভাসিয়ে, চল্লিশ পেরিয়ে তিনি তাকে নিয়ে করলেন গৃহত্যাগ। অবদমিত মন, নিরুদ্ধ বাসনা, বহু দিনের শিক্ষা-দীক্ষার বাঁধন ছিঁড়ে স্বার্থ-চেতনা তাঁকে কোন পথে নিয়ে গেল! কিমাশ্চর্যং? কিন্তু আশ্চর্য কিছু নেই।

সব চেয়ে বড় আশ্চর্য মন আর দেহের সুপ্তি। আপাত-দৃষ্টিতে কত নিরীহ, কত ঘরোয়া, কত নিশ্চিন্ত তৃপ্তির আভাস। কিন্তু, ওদের পিছনে আছে কত কার্য-কারণ, প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল গ্রন্থি। সে গ্রন্থি-উন্মোচন মনস্তত্ত্ববিদের এলাকা। আমরা শুধু ঢেকে-ঢুকে, টান্-টোন্ ক'রে ভদ্র পরিচ্ছন্নতার সন্ধান করি। শান্তি ও শৃঙ্খলার অনুশীলন করি। যে স্বামী-স্ত্রীর ধৈর্য-স্থৈর্য আছে, সূক্ষ্ম রস ও বিচার-বোধ আছে, সৌন্দর্য ও শালীনতার আন্তরিক পিপাসা আছে, এক কথায় নিষ্ঠা আছে, তাঁরাই সুখী। (আমার এখন যে বয়স, সেটা নাকি মারাত্মক। গৃহিণী বলেন, কাব্য-টাব্য বাজে কথা। তোমাদের বড় ছুঁক্ ছুঁকে মন। কি জানি! এত কথা লিখে আর তাঁর মন্তব্য শুনে, নিজেকে সংযত জেনেও মন হচ্ছে—বড় ফচ্ কে)

বড়বাজার

এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর ছিল এক রাণী। গল্পের আবম্ভটা মৃদু এবং নিঝ ঞ্ঝাট। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, দৈব প্রয়োজনে অথবা রাজার খুশি ও খেয়াল মত রাজ-মহিষীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সাত নম্বরে গিয়ে ঠেকেছে। অবশ্য এক-জন হলেন পট্ট-মহিষী অর্থাৎ সুয়োরাণী আর একজন হলেন দুয়োরাণী। এঁদের বাদ দিয়ে গল্প এগুতেই পারে না। তেমনি রাজধানীও একদিন ছিল ক্ষুদ্র এবং অনায়ত। তার জীবন ছিল সরল, চাহিদা ছিল কম। তাই রাজপথ বল্‌তে বোঝাত একটিই প্রশস্ত পথ, পুরীর 'বড় দণ্ডার' মতন। সেই পথ দিয়েই রাজার যুদ্ধযাত্রা এবং বিহার যাত্রা। সেই পথই ছিল রাজ্যের সুখ-দুঃখের উত্থান-পতনের নির্বাক সাথী। সাধারণ প্রজারা থাকত রাজপুরীর আশে-পাশে অথবা বাইরে। তাদের যাত্রাপথ নিয়ে কোন কাহিনীই মাথা ঘামাত না। দিনকাল বদ্‌লে গিয়েছে। রাজধানীতে এখন প্রজারাই বাস করে, তার আয়তন এবং বিস্তার এখন ক্ষুদ্র রাজ্যেরই সামিল। জীবন সমস্যা সঙ্কুল। সমস্যাগুলিও জটিল। তাই রাজপথ এখন একাধিক। প্রশস্ত এবং সঙ্কীর্ণ, ফাঁকা এবং ঘিঞ্জি রাজপথের দু'ধারে নানা ধরণের জীবন ও জীবিকার সমাবেশ। একই অঞ্চলে ধনী ও দরিদ্র, কবি ও কারিগর বাস করে। নিম্ন মধ্যবিত্তের কুঠুরীর গা ঘেঁষে উঠেছে স্পর্দ্ধিত প্রাসাদ। দরিদ্র

বস্তীর অদূরেই দাঁড়িয়ে থাকে আলো ঝল্‌মল্‌ পান-ভোজনশালা অথবা সুসজ্জিত চিত্রনাট্য মন্দির।

তবু এই বিশাল রাজধানী কল্‌কাতার একটি বিশিষ্ট স্থানীয় চরিত্র আছে। কল্‌কাতার রাজপথগুলি একদিক থেকে যেমন সর্বজনীন, আর একদিক থেকে তেমনি তার আঞ্চলিক রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেক রাস্তা ও অঞ্চলের ঐতিহ্য প্রাচীন, অনেকগুলি আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কোনও পল্লী নির্জন, কোনওটি বা সরগরম। কোনও অঞ্চল ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আরামস্থল, কোনওটি বা নিতান্তই প্লীবিয়ন। এক অঞ্চলের সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি আর এক অঞ্চলের জীবনপ্রণালী থেকে স্বতন্ত্র। ইংরেজ আমলে পার্থক্যটা চোখে পড়ত বেশি। জনসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের অন্তরালে এক একটি অংশ যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে বাস করত। রাজপুরীতে সুয়োরাণীর এলাকা ছিল চৌরঙ্গী এবং পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণ দিক। দুয়োরাণী ছিল মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম কল্‌কাতা। শ্বেতাঙ্গ বণিকের কর্মভূমি ছিল লালদীঘির চারধার এবং ক্লাইভ স্ট্রীট। আর দেশীয় বাণিজ্যের হৃৎপিণ্ড ছিল ক্যানিং স্ট্রীট থেকে চিৎপুর ধরে বড়বাজার অঞ্চল। শহরের বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে ঘটকতা করত লম্বা রাজপথ আর তারি ওপর দিয়ে চলন্ত যানবাহন। বর্তমানে দেশে নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে রাজধানী ও রাজপথের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড়বাজারের অনেক অ-বাঙ্গালী অধিবাসী এখন বালীগঞ্জ ও টালীগঞ্জ,

সাদার্ণ এভিন্যু আর রিজেন্টস্ পার্কে নূতন বাসিন্দা হয়েছেন। তাই এক নজরে কল্‌কাতার সর্বজনীন চরিত্র, তার বিপুল ব্যাপ্তি আগন্তুকের মনকে অভিভূত ক'রে ফেলে। কিন্তু কল্‌কাতার যাঁরা ঝানু ব্যবসাদার, পুরাণো অধিবাসী অথবা অভিজ্ঞ পথিক, তাঁরা জানেন এই শহরের 'কসমোপলিটান' চেহারার পিছনে আছে আঞ্চলিক পরিচয়, স্থানীয় বর্ণ, গন্ধ ও রূপ। বড়বাজার হল এমনিই একটা অঞ্চল, যার মধ্যে পথিক অনায়াসে পথ হারিয়ে ফেল্‌তে পারে কিন্তু ভুল ক'রে শহরের অন্য অঞ্চলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেল্‌তে পারে না। এখানে দাঁড়ালে অথবা পথ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে মনে হবে না এটা শ্যামপুকুর অথবা চাঁপাতলার সগোত্র আত্মীয়। প্রতিতুলনায় রেড রোডের নির্জন প্রসার চৌরঙ্গীর আলোকিত রাজপথ, ছায়ায় ঘেরা বেলভেডিয়র, শান্ত স্নিগ্ধ লেক অঞ্চলের জন্য মনটা তৃষিত হতে পারে বটে। কিন্তু কাছাকাছি চিত্তরঞ্জন এভিন্যু অথবা দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটের দু'ধারে যে সমান ছাদের ইমারতগুলি নূতন আমদানি ঢংয়ে তৈরী হয়েছে, তাদের সঙ্গে কাঠের ঝিলিমিলি লাগানো, পার্টিশ্যন' দেওয়া পাঁচতলা কুটীর খুপরিগুলির কোন মিল নেই। নতুন কংক্রীট ঢালাই রাজপথ আর জয়পুরি লাল্‌চে রঙের বাড়ীগুলির সঙ্গে খাঁটি বড়বাজারের আদি ও অকৃত্রিম রাস্তা মরচে-ধরা নল আর লোহারফ্রেমের অপরূপ স্থাপত্য নমুনা কোনও সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভ্রাম্যমান বিদেশী হাওড়া স্টেশন পেরিয়ে যখন রাজধানীতে প্রথম প্রবেশ করেন,

স্ট্র্যাণ্ড আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন শহর সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা হয় তা ভগবানই জানেন। অল্‌ড্যাস্ হাক্‌স্‌লি বোম্বাই শহরের প্রথম প্রেমালিঙ্গনেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বড়বাজারের শিরোদেশে জগন্নাথ ঘাটের চন্দন ছাপ মার্কা ও টিকিতে ফুল-বাঁধা উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণকুল আর বড়বাজারের প্রকাশ্য রাজপথে ব্রাহ্মণী ষাঁড়ের যদৃচ্ছা বিচরণে পথিক ও যানবাহনের স্থগিত গতি—এ-সব দেখে তাঁর কী মনে হয়েছিল জানি না। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মতন রসজ্ঞ ও সমঝ্‌দারকে যদি লোহাপটির অদূরে খড়-জাব-মিশ্রিত মোষের খাটালের পিছনে, সকালে হাইড্রেন্ট জলপ্লাবিত সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলির গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে আনা যেত, তাহ'লে তাঁর "স্ট্রীট হণ্টিং"-এর নেশা কেমন ক'রে টিঁকে থাকত সেটা ভাববার বিষয়। হাওড়ার পুলটা একেবারে বড়বাজারের হনুমানজী আর মহাদেওজী মন্দিরের ঠিক মুখোমুখি টেনে না এনে, একটু দক্ষিণে ফেয়রলি প্লেস কিম্বা হাইকোর্টের কাছ বরাবর চাঁদপাল ঘাটের পাশে সরিয়ে দিলে মহাভারত এমন কি অশুদ্ধ হয়ে যেত?

আঁদ্রে মোরায়ার ভূমিকা-সম্বলিত হারেল্ সাহেবের লেখা 'দি ল্যান্‌ট্যর্ণ শো অব প্যারীস্' নামে একখানি চমৎকার বই আছে। তাতে শুধু নোতর্ দাম্, ইফেল টাওয়ার বা শঁ্যা ইলিজের রূপচিত্রণ নেই, আছে অর্দ্ধ পরিচিত, অপরিচিত অঞ্চল-গুলির অনবদ্য রেখাচিত্র, যেখানে হরেক রকম মানুষ তাদের তালি দেওয়া জীবন নিয়ে বাস করে, আনাগোনা করে অনাহূত

অঞ্চল যাযাবর দল তাদের বিচিত্র জীবিকার পশরা নিয়ে। আমার মনে হয়, যদি কোনও বাঙালী লেখক এই শহরের বিভিন্ন রাজপথের কেন্দ্র ক'রে আনাচে-কানাচের সন্ধান দেন, আঁকতে পারেন ঐ সব অঞ্চলের সরল জটিল জীবনায়ন, তাহ'লে সে গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হবে বড়বাজার—যে বড়বাজারের রূপ শুধু ট্রাম-বাসের জান্‌লা থেকে চকিত দৃষ্টিতে দেখা নয়। কটন্‌ স্ট্রীট, ক্রস্‌ স্ট্রীট, বাঁশতলা অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর রোড এবং মনোহর দাসের স্ট্রীটের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে অলিগলিতে ঘুরে শান-বাঁধানো, গাড়ীর চাকায়-ক্ষয়ে-যাওয়া পাথুরে রাস্তার দু'ধারে অন্ধকার ঘুপ্‌সি জীবনযাত্রার সাক্ষাৎ এবং বাস্তব পরিচয়।

এমন একদিন ছিল যখন বড়বাজারের মধ্যে দিয়ে আনাগোনা করতুম, বিরক্ত হতুম তার হতশ্রী রূপ দেখে, বিস্মিত হতুম অখ্যাতনামা গলির ওপরে গদীগুলোর মধ্যে অজস্র হুণ্ডী-নোটের কারবারের কথা ভেবে! মুখের কথায় লাখ টাকার লেন-দেন হচ্ছে, কিংবা টেলিফোনযোগে তেজীমন্দার ব্যবসা চলছে আর গণেশ মূর্তির নীচে কাঠের বাক্সর ওপরে, খেরোয় বাঁধা লম্বা লম্বা জাব্‌দা খাতার বুকে দু'টো হিজিবিজি কালির আঁচড়ে কোটি টাকার ডেবিট-ক্রেডিটের হিসাব-নিকাশ কেমন অনায়াসে হয়ে যাচ্ছে, এ-সব ভেবে গায়ে রোমাঞ্চ হত। সোনাপটি, চিনিপটি, খেংরাপটি, রাজাকাটরা, মনোহর কাটরা প্রভৃতি জায়গাগুলির নামোচ্চারণের সঙ্গেই কেমন একটা অসহায় সম্ভ্রমবোধ জাগত মনে। ভাবতুম—সুপুরি আর

ঝাড়াই-মসলা, লোহার পাইপ আর ঢালাই কড়া বালতি পাইকারী দরে সুবিধায় কেনবার জন্যে বড়বাজারে কোন ভদ্র সন্তান স্বেচ্ছায় কর্মভোগ করতে আসে! আশ্চর্য বোধ করতুম যখন অপরিসর রাস্তার মোড়ে দেখতুম, সারবন্দী ঠেলাগাড়ি চলেছে হাজার হাজার বোলটু-নাটের বস্তা নিয়ে, আর পিছন দিকে ট্রাম-বাস জ্যাম্ হয়ে ক্রমাগত হর্ণ বাজাচ্ছে। ভাবতেও পারতুম না, কেমন ক'রে গরাণছাল অথবা শুধুই হর্তুকি ছালাবন্দী হয়ে উঠছে গিয়ে জাহাজের খোলে, বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে আনছে বিদেশী বণিকের কাছ থেকে। এখন আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখি না। রোমাঞ্চ জাগে না কলম্বসের আবিষ্কারের মতন। এখন বড় বাজারের হৃৎস্পন্দন যেন চিনেছি মনে হয়। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা-উপশিরায় রক্তছন্দের ধ্বনি একটা বেদনাবোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আসে। বুঝতে পারি—এখানেও জীবন এবং সে জীবনের সমস্যা একই। সোনা-রূপার দর আর ফাট্‌কা খেলার পিছনে আছে ছোট ছোট কারবারের লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ—আছে হাঁপধরা দেয়ালের প্রাচীরে আবদ্ধ অস্বাস্থ্যকর জীবনের স্বপ্ন-বিভ্রম। বড়বাজারের বড়ত্ব আর বাজার-দরের আশ্চর্য ওঠানামা আর মনকে অভিভূত করে না।

বড়বাজার হল রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র—অর্থাৎ বৃহত্তর কলকাতার মধ্যেই আর একটি শহর—যেখানে বাঙালী গুজরাটী, সুরতী-ভাটিয়া মাড়োয়ারী সম্প্রদায় এক সঙ্গে আপন ভাগ্য-সন্ধানে জীবন-যাত্রার ঐক্যতান রচনা ক'রে চলেছে। হয়তো হট্টমনের

হট্ট-সঙ্গীত নিতান্তই বে-সুরো। তবু তার ছন্দটা বাস্তব। সকাল পাঁচটা থেকে রাত ন-টা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সুরে অক্লান্ত সাধনায় সেই রূঢ় সঙ্গীতের প্রাণপণ রেওয়াজ চলেছে। কর্মব্যস্ত কোলাহলের ওপর যবনিকা ফেলে দেয় হয়তো চিত্রতারকার কোনও বহুশ্রুত গানের কলি।

উত্তরে পাথুরেঘাটা, গণেশ টকীর গা ঘেঁষে পূব-পশ্চিমে টানা রাস্তা, তার পশ্চিমে পোস্তা আর গঙ্গার ঘাট, পুবে কলা-বাগান পেরিয়ে গ্যাঁড়াতলার মোড় থেকে চিৎপুরের তামাক আর ফলের বাজার আর দক্ষিণে ক্যানিং স্ট্রীটের মোড় থেকে মুর্গীঘাটা—এই হল বৃহত্তম বড় বাজারের চৌহদ্দি। খাস্ বড় বাজার পশ্চিমী শহরের চকগুলির মতোই সঙ্কীর্ণ ও সীমা-বদ্ধ। কিন্তু বড়বাজার বলতে ঐ সারা অঞ্চলের সমগ্র ছবিটাই ভেসে ওঠে। বড়বাজার ঠিক রাজপথ নয়। ওটা হল দেশীয় বাণিজ্যের রাজমহল অথবা নাটমহল। চিৎপুরের মোড় থেকেই সওদাগর পুত্র যেন জেটির ঘাট পর্যন্ত সাষ্টাঙ্গ শুয়ে পড়ে মহালছ্মীর পদে বার বার প্রণাম জানাচ্ছে—ধনং দেহি, ধনং দেহি।

আমার স্বামী

সংখ্যা-বিজ্ঞান কিছু অভ্রান্ত বেদ নয় আর তার সাহায্যে সচেতন অথবা অবচেতন মানসের গভীরে প্রবেশ করা এবং একটি সাধারণ মান-নিরূপণ করা খুব সহজ নয়, তা জানি।

কিন্তু মোটামুটি চোখে যা পড়ে এবং বিচার-বিশ্লেষণের ফলে যেটা বোধগম্য হয়, তা থেকে বলা যায় যে, 'আমার স্বামী' সম্পর্কে শতকরা আশিজন মহিলার মনোভাব অনেকটা একই রকমের। তরুণী হন, প্রৌঢ়া হন, আর বর্ষীয়সীই হোন, স্বামি-সম্বন্ধে আলাপ আলোচনায় অল্পবিস্তর সবাই মুখর। এবং সে স্বামীর যে চিত্রটি চিত্তপটে অঙ্কিত থাকে, তাতে রঙের টান-টোনের আর তুলির পোঁচের ছোট-খাটো ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকলেও, কল্পিত মূর্তিখানির গঠন-বৈশিষ্ট্যে তেমন কিছু বিভেদ নেই। বাল্যকালের পুতুল খেলা আর শিবপূজোয় যে অঙ্কুরের জন্ম, কৈশোরে সেই স্বামি-জল্পনার প্রথম উন্মেষ হয়ে থাকে। তারুণ্যে তারই বিকাশ-ব্যঞ্জনা, প্রৌঢ়ত্বে তার সারবান্ উপলব্ধি আর বার্ধক্যে সেই ভাবধারার বাগ্‌বহুল পরিণতি। পটখানির নিজস্ব সত্তা বিশেষ কিছুই থাকে না। প্রয়োগ-শিল্পীর প্রয়োজনাতেই তার কৃতিত্ব এবং সার্থকতা। আঙ্গিকের কৌশল যদি করায়ত্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে আমার স্বামী তোমার স্বামীর চেয়ে অনেক ভালো। আসলে কিন্তু সেই একই বিষয়বস্তু। আলোক-পাত, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ আর ছাঁটাই শিল্প যাঁর যত নিখুঁত, তাঁর ছবিখানি ততই মৌলিক, উৎকৃষ্ট।

কিংবা কথাটা ঘুরিয়ে বলাও চলে। স্বামী হলেন কখনো অসহায়, কখনো বা দুরন্ত অথচ বাধ্য। কখনো লীলাময় মুরলীধারী, কখনো বা হেলায় গোবর্ধনধারী, কখনো প্রেমনিষ্ঠ বল্লভ, কখনো বা ছলনাময় নাগর। কখনো ত্রিলোক-পালন, কখনো বা মধুসূদন। অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই গোপাল। কৈশোরের অর্ধস্ফুট চেতনা, যৌবনের লাজনম্র শিহরণ, তারুণ্যের রসঘন উপলব্ধি, প্রৌঢ়ত্বের অম্ল-মাধুর্য আর বার্ধক্যের তিক্ত স্বাদ,—সকলের পিছনেই আছে সেই চরমতম ধ্যান-ধারণা-গবেষণার নিজস্ব গিনি সোনা। অর্থাৎ অধিকার-বোধের মূলধন।

বিবাহ-বাসরে স্ত্রী-আচারের জটিল প্রক্রিয়াগুলি যদি অনুধাবন ক'রে থাকেন, তাহ'লে বুঝবেন আমার বক্তব্যের সত্যতা। মধ্যবিত্ত ঘরের আবাল্য স্ত্রী-সুলভ শিক্ষা-দীক্ষা, কল্পনা-জল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে ঐ একটি দিনে। গায়ে হলুদ থেকে শুরু ক'রে কুশণ্ডিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠানগুলি আর তালাচাবি, মাকু, টাকা আর দাসখৎ লেখা প্রভৃতি আচার-উপকরণগুলি কৌলিক প্রথামত যে রকম গম্ভীর-নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়, তাতে বর্ষীয়সী সধবাদের উদ্দেশ্যটা বড় বেশি প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। কন্যাকে যেন শেষবার শিখিয়ে দেওয়া গেল—গাঁট-ছড়া যখন বাঁধা হল একটু শক্ত হয়ে চলিস্। শাস্ত্রীয় নির্দেশ-মত অনুগামিনী বধূ হওয়াই কর্তব্য। তবে চাবিছড়াটা হাতছাড়া করিস নি বাছা। ঐ আঁচলের খুঁটেই তোর স্বামী আর ওরি মধ্যে তোর যা কিছু জারি-জুরি, ভবিষ্যতের সংস্থান।

ঐ চাবির রিঙ-এই তোর সম্পত্তি আর আঁচলের মধ্যেই ভানুমতীর খেল।

ভর্তা ভরণ-পোষণ করবেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। উপার্জনে আর সর্বস্ব-সমর্পণেই তাঁর ভর্তৃত্ব। কোনো-কোনো পুরুষ হয়ত প্রথম দিকটায় নিজের হাতেই টাকাকড়ি রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্লেষাত্মক কাব্যের অস্থির প্রেরণায় তাঁকে লাগাম ছাড়তে হয় এবং বোধ করি প্রবীণ বয়সে স্ত্রৈণ নাম কেনেন। আমার স্বামীর চরিত্রগত মাধুর্য তো এইখানেই। তিনি হবেন কড়া আর রাশভারি লোক, দৃঢ় এবং দৃপ্ত। তিনি কারুর কথায় কান দেবেন না, অথচ কর্ণ-কুহরে শয্যাসঙ্গিনীর বেদমন্ত্রে সূর্যের মত নিজেই জ্বলে উঠবেন। কিন্তু উত্তেজিত হবেন না। ঘরের কথা ভুলেও ফাঁস করবেন না, অথচ বাইরের যাবতীয় কথা নিরবগুণ্ঠভাবে নিবেদন করবেন একটিমাত্র অবগুণ্ঠিতার কাছে। ছোট কথা নিয়ে তিনি কদাচ মাথা ঘামাবেন না, অথচ তুচ্ছ সংবাদগুলি নীরবে হজম ক'রে যাবেন। স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর দৈব নিরাসক্তি, অথচ নারীচিত্ত তাঁকে দেখে আলোড়িত, তাঁর সংস্পর্শে উন্মথিত হয়ে উঠবে। তাঁর হৃদয় হবে মহান্। সামাজিকতায়, লৌকিকতায় থাকবে তাঁর অকৃপণ দাক্ষিণ্য। যূথপতির অমিত শক্তি সত্ত্বেও যৌথ জীবনে তিনি হবেন আনত স্নিগ্ধ কোমল। এমন না হলে 'আমার স্বামী'! সে স্বামী ভর্তাই হোন আর কর্তাই হোন, তাঁর ওপরেও যে আমার কার্যকরী মোলায়েম কর্ত্রীত্ব চলে থাকে এবং সজোরেই চলেছে, এই মনোভাবটাই স্বাস্থ্যহীন গৃহিণীকে

আবার ভালো হয়ে বাঁচবার সাধ যোগায়। তাঁর পাংশু অধরে আনে মোনালিসার হাসি। এই অধিকারের নিশ্ছিদ্র নিশ্চিন্ততা যতদিন না কায়েমী হয়ে মনের মধ্যে বসে যায়, আপনার সহজাত প্রবৃত্তি যতক্ষণ না নিরঙ্কুশ সম্পত্তি-ভোগে রূপান্তরিত হয়, ততদিন অশান্তি, বুক ধড়ফড়ানি, আধি-ব্যাধির উৎপাত। হয়ত বা মনোবিকলন। সে অস্বস্তি আর অক্ষুব্ধ আক্রোশের জ্বালা এ জীবনে জুড়োতে চান না। ঢল ঢল মাধুরীতে, নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা আদায় ক'রে নিতে যে ললিতা তাঁর মাধবের অঙ্কে একদিনও এলায়িত হননি নৈরাশ্যজনিত মৃত্যুকামনায়, স্ত্রীত্বের ক্ষুণ্ণ অহংকারে—তিনি মানবী নন।

'আমার স্বামী' সম্বন্ধে সাধারণ মনোভাবটা একটু জটিল। তার মধ্যে কত প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য এবং ক্রমশ প্রকাশ্য মানসিক স্তবভেদ! ওতে আছে একাধারে উদারতা আর ঈর্ষাপরায়ণতা, মহত্ব আর ক্ষুদ্রতার এত সূক্ষ্ম মিশ্রণ যে, সেই সব অসংগতির সঙ্গে মোটামুটি সংগতির মিল রক্ষা ক'রে চলা সাধারণ স্বামীর পক্ষে রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। সংসার-সমুদ্রে দাম্পত্যের ফুটো নৌকা নিয়েও কেউ কেউ অনায়াসে পাড়ি দিয়ে থাকেন, কেননা তাঁরা ভাগ্যবান্ অভিজ্ঞ নাবিক। কিন্তু সুসজ্জিত প্রশস্ত তরণী-বক্ষে একটি স্নিগ্ধ মধুর তরুণী জায়াকে নিয়ে অনুকূল বায়ু আর স্রোতেও কাঁচা মাঝি অনেক সময় বানচাল ক'রে ফেলেন। কোন্ বাষ্পলেশহীন কথা থেকে মেঘোদয় হয়ে ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি হতে পারে, কতটুকু আশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য, কতটুকু ছলনার মাত্রা লঙ্ঘন

হলে সেটা সুপটু অভিনয় হয়, স্ত্রীধন থেকে কতখানি ঋণ গ্রহণ করলে বিশ্বাসহন্তার অদৃশ্য কলঙ্ক লাগে না, পত্নীর উপস্থিতিতে ভগ্নীর কাছে কোন কিছু চাইলে সেটা কেমন ক'রে অপমানে দাঁড়ায়, কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতা কিম্বা জননীর পরামর্শ গ্রহণ করলে সেটা কিভাবে আসন্ন দুর্দিনে নিরাশ্রয় অবলার অবশ্যম্ভাবী নির্যাতনে পরিণত হতে পারে—এ সব সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা বুঝে আগে থাকতে যিনি বাঁচিয়ে চলেন, তিনিই প্রকৃত স্বামী-পদবাচ্য। একমাত্র সেই স্বামীই কাঁটায় ভর্তি কেউটের বাসা পানা পুকুরে নেমে সিদ্ধিরূপ পানিফল সংগ্রহ করতে পারেন।

'আমার স্বামী' তিনিই, যিনি সর্বাগ্রে অবাঞ্ছিত অপদেবতাদের সরিয়ে দিয়ে যজ্ঞেশ্বরীর একাগ্র পূজায় অবহিত হন, যাঁর বিনম্র অর্চনায় কামস্তুতির স্পর্শ থাকলেও নিঃস্বার্থ তুষ্টির পবিত্র আত্মপ্রসাদটাই বেশি। তিনি জীর্ণ বাহন হলেও শালীবাহন। আমরণ সংসারের ভাড়াটিয়া গাড়ি টেনে টেনে তিনি চলবেন, কিন্তু চড়বেন না। কেন না পুত্রকলত্র দৌহিত্র-ভরা গার্হস্থ্য আশ্রম তো তাঁরই স্বকৃত কর্ম, অতএব একার দায়িত্ব। তিনি দিয়ে যাবেন আর ক'রে যাবেন, প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে। অথচ স্ত্রীর অবাস্তব দুঃখ বোধে আন্তরিক সহানুভূতি জানাবেন সর্বদাই। কর্মব্যস্ত বা শরীর খারাপ থাকলেও অতিথিদের নিয়ে গল্প করবেন। বান্ধবীদের সমাদর করবেন যথাযোগ্য ভাষায়, কিন্তু রসিকতা যেন বেশি দূর না গড়ায়। স্ত্রীর বন্ধুকে একলাই পৌঁছে দিতে

পারেন, তবে ট্রামে। ফিরবেন কিন্তু তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে। কাজের পর সকাল সকাল বাড়ি চলে আসবেন। আর শনিবারের সন্ধ্যায় মাত্র দু'খানি সিনেমার টিকিট। এই হল আদর্শ স্বামীর আংশিক রেখাচিত্র।

এ ছাড়া আরও কত দিক আছে। আমার স্বামীর বাস্তব রূপ, কল্পিত রূপ, ঈপ্সিত রূপ, তাঁর সফলতা, তাঁর ব্যর্থতা, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির নিরর্থকতা এবং অর্থের সার্থকতা, তাঁর সামাজিকতার, পারিবারিক কর্তব্যের ত্রুটিহীন নিষ্ঠা, বাজারে তাঁর দেব-দুর্লভ প্রতিষ্ঠা, ঘরে তাঁর অসীম সহিষ্ণুতা, দার্শনিক আত্মস্থতা ইত্যাদি এক একটি বিষয় নির্দেশের সূত্র ধরে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ রচনা করা যায়। নারী-সত্তার যেমন বহুমুখী প্রকাশ, স্বামী-সম্পর্কে তেমনি অফুরন্ত তার অস্ফুট কামনা। ক্ষেত্রবিশেষে কখনো তা অবরুদ্ধ বাসনার ট্র্যাজেডি, কখনো বা সুপ্রতিষ্ঠ সাম্রাজ্য-শক্তির উন্মুক্ত ব্যবহার, কখনো বা স্থিরবুদ্ধি স্বৈরতন্ত্রের কূটনীতি-প্রয়োগ, কখনো বা নির্বোধ সোহাগিনীর উগ্র বিজ্ঞাপন।

ঘরেতে 'স্বামী' মোটামুটি পুরুষই থাকবেন। তবে দরকার মত 'স্ত্রী' হয়ে যাবেন। অর্থাৎ স্ত্রীর শারীরিক অথবা মানসিক খবর যখন খারাপ, তখন তিনি অনায়াসে ছেলেমেয়ে ঝি-চাকর সমেত গোটা সংসারটাকে সাপ্‌টে নিয়ে কাজ চালাবেন। কিন্তু গৃহিণীর সুচিন্তিত নির্দেশ অনুসারে। অস্থির হলে চলবে না, যেহেতু পুরুষের ধৈর্যস্থৈর্যই নাকি প্রধান গুণ। স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং মেজাজ যখন ভালো, তখন সংসার নিয়ে খামোকা মাথা

ঘামাবেন না। অর্থাৎ মাত্র খরচ জুগিয়ে যাবেন এবং মধ্যে মধ্যে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করবেন আর কিছু চাই কি না। তার বেশি কিছু করলে অথবা ভাবলে শুনতে হবে—বড় মেয়েলি স্বভাব! ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য, পড়াশুনো, তাদের খাওয়া-দাওয়া, বেশ-ভূষা ব্যাপারে নীরব থাকাই সমীচীন। যদিও তাতে আপনার আপত্তি বা বিরক্তির কারণ থাকতে পারে। পিতৃ-গৃহের যে ধারা, যে আবহাওয়া, যে কর্ম-প্রণালী—সেগুলি স্বামীর ঠিক অনুমোদিত না হলেও নিজের সংসারে যখন প্রবর্তিত হবেই, তখন তা নিয়ে আদর্শ স্বামী বিচলিত হবেন না। তা হলে অভিযোগ শুনতে হবে: "পুরুষ মানুষ হয়ে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাটা এই প্রথম দেখলুম। ও বাড়ীতে বাবা কিছুই দেখেন না, বোঝেনও না। কিছু জিগ্যেস করলেই বলেন, আমি জানি না, তোমার মাকে বলো। আর দাদাও তো বাপু একালের ছেলে। পাশও তোমার মতন করেছে, মাইনেও এবারে বুঝি সাত শো হল। কিন্তু কে বলবে সাবালক! মা তোয়ালে না দিলে বাবা বাথরুমে যান না, প্যার্সে টাকা ভরে না দিলে দাদা রাস্তায় বেরুতে পারে না। আর আমার কপালে ঠিক উল্‌টো! সব বিষয়ে নিজের মত খাটানো। আমি হচ্ছি বিনি মাইনের দাসী। মুখ বুজে তোমাদের পরিচর্য্যা করি আর ভূতের ব্যাগার খাটি মিছিমিছি। কেন না আমায় নইলে তোমার খুবই চলে।"

পিতৃ-গৃহের বিস্তারিত উল্লেখ হল মেয়েদের জীবনযাত্রার নিত্য-কর্ম-পদ্ধতি। তার কল্পিত মাহাত্ম্যটা যতই মারাত্মক

হোক্, আপনি ব্যগ্র ভাবে কেবল সায় দিয়ে যাবেন, যেন সেটা তর্কনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ সত্য। কাছে-পিঠে শ্বশুর বাড়ি হলে হামেশাই যাবেন, খবর আনবেন। স্ত্রীও যাবেন নিজের ইচ্ছামত—কোনো কৈফিয়ৎ নেবেন না, বা ফিরে আসা সম্বন্ধে কোনওরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করবেন না। কেন না, আদর্শ স্বামী স্ত্রীর অনুরক্ত হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই আনুগত্য স্থানে অস্থানে প্রকাশ ক'রে ফেলে তাকে বিব্রত করা সত্যিই অনুচিত। কবে আপনি একটা গদ্যময় উক্তি করেছিলেন: এ অসময়ে আর অসুখ বিসুখ বাধিয়ে বোসো না, ধনে-প্রাণে মারা পড়বো। সেই কথাটাই ইনিয়ে-বিনিয়ে তিনি যদি স্বয়ং কোনও কম ভাগ্যবতীর সামনে পল্লবিত ক'রে শোনান যে, তাঁর অসুখের সম্ভাবনাতেই আপনি অবুঝের মত কাতর হয়ে সহসা সজল-দৃষ্টি হয়ে পড়েছিলেন, তাতে কিন্তু দোষ হয় না। আর শ্বশুরালয় যদি শহরের ভিন্ন অঞ্চলে হয়, তা হলে মাসে দু'এক ক্ষেপ স্ত্রীকে নিয়ে বাপের বাড়ি পাড়ি দেবেন এবং সারাটা দিন হাসি-গল্পে মিলে-মিশে কাটিয়ে রাত্রে ফিরে আসবেন এক সঙ্গে, যদি অবশ্য বিবাহ পুরানো না হয়ে গিয়ে থাকে। আর যদি গৃহিণী প্রৌঢ়ত্বের কোল ঘেঁসে চলেন, তাহ'লে পিতৃগৃহের অনুরোধ মত স্ত্রীকে রেখে আসবেন এবং তাঁরি নির্দেশমত অন্য দিন আবার যথাসময়ে ফিরিয়ে আনার জন্য হাজিরা দেবেন। কোনও ধাপ্পাবাজি চলবে না। শ্বশুরবাড়িতে স্বামী হবেন ঘরের ছেলের মতন। অর্থাৎ পায়াভারী জামাই হয়ে থাকবেন না। কাজে-কর্মে কর্তব্য-সম্পাদনে আলাপনে, স্বেচ্ছায়

দায়িত্ব-গ্রহণে তিনি হবেন পুত্রবিশেষ। অথচ পুত্রের প্রাপ্য প্রভাব দাবি করবেন না। এক কথায় মেয়ে যে কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, স্বামী হবেন সেই বহু-প্রত্যাশিত গৌরবের জীবন্ত ও চলন্ত ভাষ্য। রাজপুত্র না হোক্, সিভিলিয়নের সঙ্গে বিয়ে হলে এর চেয়ে বেশি সুখে থাকা সম্ভব হত না, এই কথাটি 'আমার স্বামী' আজীবন প্রমাণ ক'রে যাবেন। যেন শাশুড়ীর দল বলতে না পারেন, তাঁরা ঠকেছেন। শ্বশুরালয় যদি হয় সবাক্ নাট্য-মন্দির, স্বামী হবেন দশ টাকা টিকিটের নির্বাক্ অভিজাত দর্শক। নায়িকার নেপথ্য প্রেরণায় তিনি যেন থাকেন ভরপুর।

সমস্ত নারীকে যদি পাটিগণিতের ছকে ফেলা যায়, তাহ'লে তাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হচ্ছে স্বামিত্বের গৌরব-গুণন। আমার স্বামী ভালো হলে তো তোমরা বলতে বাধ্য হবে। কিন্তু খারাপ হলেও ভালোটা তো আমাকেই বলতে হবে। তিনি রাগী হলেও তাঁর কোপনতাটুকুও গর্বের বস্তু। তিনি মিশুকে না হলে তাঁর গাম্ভীর্যটাই অসাধারণ। লোকে যাই বলুক আর সে ব্যক্তি নিজে যাই হোন্, তাঁর ওকালতিতে, তাঁর ফর্দ-করা গুণাবলীর সালঙ্কার ইস্তাহারে কোন নারীই পরাঙ্মুখ নন। বরঞ্চ তাঁর দোষক্ষালনে, প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা-অর্জনে কেউ বা উন্মুখ হয়ে থাকেন, কেউ বা বিপক্ষকে বাগে পেলে ঝেড়ে শুনিয়ে দেন। স্বামী-সমালোচনায় স্ত্রীলোকের যে অসহিষ্ণুতা, সেটা সতীত্বের নিষ্ঠা না হলেও পত্নীত্বের পরাকাষ্ঠা নিশ্চয়ই। আর 'আমার স্বামী' যদি সত্যিই ভালো হন, তা হলে সে

ভালো যে কি সাংঘাতিক ভালো, লোক বুঝবে বা জানবে কি ক'রে? সে এক সংক্ষিপ্ত মহাভারত, বিন্দুতে সিন্ধু। খিলদেওয়া ঘরে ভাঙ্গা চৌকিতে বাঁটহীন তালপাখাধারী ঘামাচি-ভরা লোমশ ভুঁড়িদারই হোন আর সুসংস্কৃত সুগন্ধ বেশে স্তিমিত আলোকিত নির্জন শীতল কক্ষে পালঙ্কে শয়ান উষ্ণ-নিশ্বাস সুপুরুষই হোন, তিনি অখিলের পতি। অলক্ষ্মী সব তোমরাই। সম্মার্জনীর নিপুণ চালনায়, জ্বলন্ত চুল্লীর তপ্ত ভস্মে তোমাদের মুখ বন্ধ করা উচিত। আমার স্বামী কৃপণ হোন আর বদান্যই হোন্, দরিদ্র হোন অথবা বিত্তবান্ হোন, মূর্খ হোন আর বিদ্বান্ হোন, তাতে তোমার কি? হে ভত খাদিকে, তুমি তোমার ঘর সামলাও, আপন চরকায় তেল দাও। আমার ললাট দগ্ধ হলে তোমার ললাট যে উজ্জ্বলতর হয়, শিকারের গন্ধে নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, তা জানি।

যে সব মেয়ে শিক্ষিত ও মার্জিত, তাঁরা অবশ্য কোমর বেঁধে বগি-বিন্দির মতন স্বামী নিয়ে ঝগড়া কাড়াকাড়ি করেন না। বড় জোর, রেগে গেলে আঁচড়ে দিতে পারেন। কিন্তু মূলে সেই একই ধারণা—সূক্ষ্মতররূপে কাজ করতে থাকে, এই যা তফাৎ। আমার স্বামী আমার নিজস্ব সম্পত্তি। আমার খাস্ কামরার সামগ্রী—বিলাসের, ব্যবহারের, যত্নের, অযত্নের। যখন যা খুশি। তাঁর গানের গলা, তাঁর ছবির হাত, তাঁর পড়ার ধাত, তাঁর মুখের বাত্, তাঁর লেখার প্রসাদ নিয়ে লোকে ধন্য হোক্, বাহবা দিক্। আমি নিজে কদর করি আর না করি, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দরকার

হলে দেখবো, বুঝবো, নাড়বো চাড়বো, হয়তো ভাঙবো আবার জুড়বো, নয়তো ঝেড়ে-মুছে সাজিয়ে তুলে রাখবো। আমার স্বামী মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু তিনি তো আমার হাতেই তৈরী, শুধু নাড়ীটুকুই কাটিনি। সেই মানুষের হাব-ভাব, স্বভাব, চলন-বলন আমারই নিপুণ রিপু-কর্ম। টেবিল-ঢাকা কাপড়, রেডিও, গাড়ি-বাড়ি-ফোন্, পর্দার ছিট প্রভৃতি সব জিনিসই যেমন আমার মত ও রুচি অনুযায়ী কেনা ও সাজানো, আমার স্বামী তেমনি আমারই ইচ্ছার পরিপূরক, আমার সাধের আয়না। তিনি বড় হলে, পদস্থ হলে আমার এবং আমার বাপের বাড়ির কি লাভ? গৌরব তাঁর নিজেরই বংশের, উপকার আর দশজনের যাঁরা তাঁরই প্রত্যাশী। স্ত্রী হয়ে স্বামীর গুণ-কীর্তন করা সাজে না। তবু না বলে উপায় নেই, তিনি আছেন বলেই তোমরা আছো আর আমি আছি বলেই তিনি আছেন। তাঁর যে আজ আমায় না হলে একদম চলে না, সেটা কার কৃতিত্ব? তিনি যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত বড় সংসারটাকে মাথায় ধরে আছেন, সেটা কার অদৃশ্য শক্তিতে? সংসার যে এতদিন ভাঙেনি, সেটা কার হুঁশিয়ার ন্যায়পরায়ণ গৃহিণী-পনায়? তা ছাড়া, তাঁর যদি সত্যিই কোনও দোষ-ত্রুটি থাকে, তার বিচারের ভার বাবা আমার সম্প্রদানের সময় আমার হাতেই দিয়েছিলেন। শাস্তি অথবা পুরস্কার, তাঁর প্রাপ্য আমার জিম্মায়। আমার ছাগল। কাট্‌তে হয়, আমিই কাটবো—মাথার দিকেই হোক্ আর লেজের দিকেই হোক্।

টিপে-টিপে তোমাদের দেখতে হবে না বাপু।

বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের সাধারণ মেয়েদের স্বামী-সম্বন্ধে যে মনোভাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেটা যদি বিদ্রূপাত্মক হয়ে থাকে, তার দোষ আমার নয়। দোষ বিষয়-বস্তুর, দোষ পরিবেশের। অর্থাৎ সমাজের, পারিবারিক গণ্ডীর ক্লেদাক্ত সঙ্কীর্ণতায়। এবং সে গণ্ডী-রচনায় সীতাপতিদের দায়িত্ব কিছু কম নয়। আপনার স্ত্রী যখন চেয়েছিলেন একটি ভব্য পরিচ্ছন্ন সংসারের নিষ্কলুষ হাওয়া, আপনি তখন পৌরুষ আর কর্তব্যবোধে তাঁকে বেঁধে ফেলেছিলেন একান্নবর্তী পরিবারের নির্মম নিয়মানুবর্তিতায়। তিনি যখন চেয়েছিলেন আপনি ভদ্র ও পরিষ্কার বেশে তাঁকে নিয়ে খোলা হাওয়ায় একটু বেড়াতে বেরোন, তখন আপনি হয়তো শুধু গায়ে পান চিবুতে চিবুতে লুঙ্গী পরে মাদুরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি কোনো এক চাঁদনী রাতে ছাদে গিয়ে যখন আপনারই সুকণ্ঠ থেকে একখানি গানের প্রত্যাশা করছিলেন, আপনি তখন রাসভকণ্ঠে বিনা কারণে চাকরকে ধমকাতে শুরু করলেন। মেঘ-মেদুর সন্ধ্যায় যদি তাঁর মন করুণ-কোমল হয়ে দু'টি রজনীগন্ধা-বৃন্ত কামনা ক'রে থাকে, আপনি হয়তো ঘরে ঢুকে তাঁকে খিঁচিয়ে ওঠেন, "কি যে ছাই রাঁধছ আজকাল। যা খাই, তাতেই অম্বল।" পরস্ত্রীর মনস্তত্ত্বে আপনি বিভোর হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আপনারই ঘরণীর অতি-প্রয়োজনীয় মনটির দিকে আপনি শুধু অমনোযোগী নন, একেবারেই যোগীরাজ। এ অবস্থায় নিরুদ্ধ মনের প্রতিক্রিয়া যদি প্রকাশ পায় আশাভঙ্গে, সংকীর্ণতায়,

ঈর্ষ্যায়, সন্দেহে, দুর্বলের স্বাভাবিক আত্ম-প্রতিষ্ঠায়, অধিকার-প্রয়োগের অপচেষ্টায়, তা হলে দোষটা কার? তিনি তো, শেহভ্-এর ডার্লিং-এর মতন আপনারই সামান্য ফুৎকারের তুচ্ছতর প্রতিধ্বনি!

যে সব মহিলা অত্যাধুনিক, উগ্র-সামাজিক, পেণ্ট-পাউডার-রুজ্ প্রলেপে যাঁদের প্রকৃত সত্তা চাপা পড়ে যায়, সেই সব এনামেলমুখীদের মনোভাব আমার অবিদিত। জেনেও বিশেষ কিছু লাভ নেই। 'আমার স্বামী'—এই শব্দ-সংজ্ঞাটির মধ্যে যে বিশুদ্ধ নারীত্বের স্বদেশী ব্যঞ্জনা আছে, বর্ণসংকর সংস্কৃতির ক্রোমিয়ম প্লেটে সেটা কেমন যেন বেশি মাত্রায় তির্যক্, অমানবিক হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে স্বামী যেন ব্যক্তি নন। একটা অপ্রত্যক্ষ ধারণার অস্বস্তিকর প্রতীক মাত্র। সে সব মহিলার অতি-সূক্ষ্ম জটিল মনোভাবটা যেন এইভাবে খানিকটা প্রকাশ করা যায়ঃ আমার স্বামী আমারই। তবে,—আমি নিখিলের। আমি হলুম মোগল যুগের রমণী অথবা উনিশ শতকের ফরাসী নায়িকা। আমার স্বামী হিন্দু যুগের ঋষি, প্রচ্ছন্ন এবং নেপথ্যচারী।

একবার এই রকম একটি স্বামী দেখতে পেয়ে অবাক্ হয়েছিলুম। আমাদের তনুদি'-কে বহু দিন ধরে জানি ও দেখে আসছি। শুনেছি তিনি সধবা, কিন্তু তাঁর স্বামীকে কোনো দিন চাক্ষুষ দেখিনি। তিনি যেমন সর্বকর্ম-পটীয়সী, অসীম শক্তি এবং বিপুল কায়ার অধিকারিণী, হাট-বাজার-অফিসে তাঁর যেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ, পুত্রকন্যাদের পুরুষোচিত উদ্যমে

যেভাবে মানুষ করেছেন, তাতে তাঁর স্বামীর কথা চিন্তা ক'রে দেখবার অবসর তেমন পাইনি। হঠাৎ একদিন কি যেন একটা ঘরোয়া পার্টিতে তিনি পর্দা সরিয়ে একটি ছোটখাটো, গোলগাল, চোখ-মিট্‌মিট্‌-করা, টাকমাথা মানুষকে হাত ধরে এনে আলোর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমার স্বামী'। মস্ত বড় যাদুকর যদি তাঁর বিশাল আলখাল্লার আড়াল থেকে ছোট্ট একটি ভীরু খরগোস ছানা সগর্বে বার ক'রে দেখাতেন, তা হলে এতটা অভিভূত হতুম না।

শুচিবাই

সম্রাট্ প্রিয়দর্শী সমাজ-মঙ্গলের জন্যে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং প্রজাদের পারত্রিক কল্যাণের উদ্দেশে একাধিক বিধি-ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর প্রচারিত 'ধম্ম' কথাটির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন এবং যে কয়টি নৈতিক গুণের উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সত্য, শুচি, দয়া, দান, বিনয় ও মৃদুতাই শ্রেষ্ঠ। ভারত মহাপ্রাণ অশোকের উপদেশ শিরোধার্য করেছে বটে, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করবার সুযোগ কোথায়? তবু বাঙলা দেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় প'ড়ে থাকলেও, সম্রাটের একটি উপদেশ অন্তত মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। শুচিতা অবলম্বন করেছে সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে। আর বিশেষ কিছু করে নি। কিন্তু যেটিকে নিয়েছে, সেটিকে আঁকড়ে আছে সযত্নে আজও বাইশশো বছর পরে। কর্মনিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

সত্যি, ভাব্‌তে আশ্চর্য লাগে। ভারতের সর্বত্রই তো তিনি তাঁর বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেমন ক'রে সুদূর অতীতের ব্যবধান লঙ্ঘন ক'রে ঐ 'শুচি' কথাটি বাঙালীর সংসারে কায়েমী বাসা বেঁধে নিল, সেটা কি এই প্রদেশের সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সূচনা করে না? সারা প্রাচীন আর মধ্যযুগ অতিক্রম ক'রে ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর পরিক্রমা

সেরে বাঙলার সমাজ-শাস্ত্র ও লোকাচারের ভিত্তিমূলে প্রবেশ করল ঐ শুচিবোধ। মূর্খ, শিক্ষিত, সধবা অথবা বিধবার বিধিবদ্ধ জীবনে দিল প্রেরণা! বাঙালী নরনারীর কোমল মেরুদণ্ডকে করল কঠিন, নিষ্ঠা-কাষ্ঠায় মণ্ডিত ক'রে দিল তার সাংসারিক ও সামাজিক জীবন-পদ্ধতি। শুচিবায়ুতেই হল আধ্যাত্মিক শুচির ঐতিহাসিক পরিণতি। যুক্তি হয়তো নেই, তবু এই হল ইতিহাস, তথা জাতীয় নিয়তির পরিহাস। বাঙালী পরিহাস-রসিক, যদিও বাস্তব জীবনে তারা নাকি অত্যন্ত গম্ভীর। শুচি নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, আবার পালনও করে। বাইরে আধুনিক, ভিতরে সংরক্ষণশীল। তা হোক্—ক্ষতি নেই। কিন্তু নিত্যকার জীবনে ও আচরণে এই দ্বৈতবাদ অথবা সুবিধাবাদ মারাত্মক নয় কি?

'শুচি' পদটি সুরুচিপূর্ণ। এর মধ্যে আছে পবিত্রতা, শালীনতা আর সৌম্য সম্ভ্রম। কিন্তু ঐ নিরীহ পদটিকে যদি 'বায়ু' দিয়ে সমাসযুক্ত করি, তাহ'লে হাড়মাস কালী হয়ে যায়। উনপঞ্চাশ বায়ু একসঙ্গে জেগে ওঠে, কুপিত হয় সমগ্র দেহের জটিল নাড়ীমণ্ডল। তখন নিরীহ ভুক্তভোগীকে কাতরস্বরে প্রার্থনা জানাতে হয়, "হে সর্বজ্ঞ সমাজপতির দল! জীবন্ত নরকবাস আর সহ্য হয় না। ফিরিয়ে নাও তোমাদের শুচি। এর চেয়ে অন্ত্যজের জীবনও সুখকর। চাই না মহাশুচি গোবরছড়া আর গঙ্গাজল। আমি অশুচি অস্পৃশ্য সরমা-পুত্র হয়েই থাকব, রজ্জুবদ্ধ ছাগশিশুও আমার চেয়ে স্বস্তি ও আনন্দে থাকে। আর এমন নির্জন স্থানে আমায় নির্বাসিত কর,

যেখানে রাসি বাম্‌নি নেই, নেই কোনও অনবস্থা মুণ্ডিতশ্রী বালবিধবা"।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, একটা সাধারণ কথা নিয়ে এত গৌরচন্দ্রিকার কি প্রয়োজন? আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, কথাটি মোটেই সাধারণ নয়। শুচি-বায়ুর অ-সাধারণত্ব সম্বন্ধে আপনারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন বলেই এমন বিরক্ত ও সরল প্রশ্ন করলেন। আর বাঙালী ভক্ত বৈষ্ণব একাধিক থাকলেও, গৌরচন্দ্রের ঐ বাছ-বিচারহীন 'আচণ্ডালে ধরে দেয় কোল'-গোছের অতি-বদান্য গায়ে-পড়া ভঙ্গীকে নিষ্ঠাবান্ বাঙালী মোটেই বরদাস্ত করে না। তাই শুচিবাই নিয়ে ভণিতা করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? সোজাসুজি গায়ে হাত দিয়ে কথা বললে অনেক অসহিষ্ণু পাঠক হয়তো চটে উঠবেন: 'তা বলে কি বাসি কাপড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে? ছত্রিশ জাতের সঙ্গে ছোঁয়া-লেপা ক'রে ঘরে এসে উঠতে হবে গুরু-পুত্রের মতন? তুমি কি পৈতে-পোড়া ব্রহ্মচারী যে, জাত-ধর্ম খুইয়ে বসে আছ, স্পর্শদোষ মানো না?' সত্যিই তো। হাসি-তামাসা ক'রে শুচি-কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আপনাদের বায়ুই বরং আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তাই রসিয়ে, উদাহরণ দিয়ে, ভণিতা ক'রে আপনাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় আছি। সইয়ে সইয়ে যদি অপ্রিয় সত্য শোনাতে পারি। কিন্তু অতিরঞ্জন ক'রে একটি কথাও বলছি না, বলব না—একথা শপথ ক'রে বলতে পারি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উদ্ধৃত কাহিনী শুনে হয়তো আপনারা বলবেন,

'তোমার দুর্ভাগ্য'। কিন্তু বাঙালী ঘরোয়া সংসারে সেগুলি কি আজগুবি গল্প? আপনাদের শতকরা তিরিশ জনও কি শুচিবায়ুর তিক্ত সত্য উপলব্ধি করেন নি?

বাতিক আর বাই, দু'টি কথা একার্থ-বোধক হলেও আমরা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। বাতিক বলতে আমরা বুঝি ছিট। বাতিকগ্রস্তলোক বলতে ইংরেজি 'এক্-সেন্ট্রিক্' শব্দটির ব্যবহার করি আর বুঝি খ্যাপাটে ধরণের লোক, যার স্বভাব-আচরণ মোটের ওপর হাস্যকর। বাতিকগ্রস্ত মানুষকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে চালানো যায় যদিও সময়ে সময়ে বিরক্তির উদ্রেক হয়। তবু সেখানে কৌতুকের খোরাক আছে, আছে হাসির ও মজার অবকাশ। যেমন ধরুন মুদ্রাদোষ। চলায়, কথাবার্তার ভঙ্গীতে, অভ্যাসে সে বাতিক ধরা পড়ে। কেউ বা রাস্তায় যেতে যেতে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, পাছে নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে ময়লা ঢুকে যায়। কেউ বা নাড়ী টিপে হরদম বীট্ গণনা করেন, জ্বর আসছে কিংবা হার্টের অসুখ হয়েছে বলে বিমর্ষ হয়ে থাকেন। কেউ বা বছরে দু'টি দিন মাত্র স্নান করেন। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন, 'কুয়োর দড়ি জলে ভিজে বেশিদিন টেঁকে, না কি আলনার শুকনো দড়ি বেশিদিন চলে?' আবার কেউ বা জীবনে চিনাবাদাম, তরমুজ খান না, কলেরার ভয়ে। এগুলো বাতিক। বাই হল এর ওপরে। মনের, অর্থাৎ অসুস্থ মনের, সূক্ষ্মতর ঊর্ধ্বতন অবস্থা। ওটা একেবারেই রোগ। পুরোপুরি পাগলামির সামিল। মনোবিকলনেই তার জন্ম। শুচিবায়ু এমনি একটি

বাই। অতএব প্রথমে যখন এ রোগের আভাস দেখা দেয়, তখন অঙ্কুরেই তাকে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। দরকার হলে নিষ্ঠুর হতে হবে এবং প্রতিপদে সে মনোবিকারকে ব্যাহত করতে হবে। মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে যখন কাজ হয় না, তখন মুষ্ট্যাঘাত এবং আসুরিক চিকিৎসার প্রয়োগ করতে হবে। উপায় নেই। নইলে এ রোগ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, জীবনে কত লোককে তারি জন্যে ভুগতে হবে, সংসারে নিত্য ট্র্যাজেডির অভিনয় চলবে—এসব দুর্ঘটনা গোড়ায় কল্পনা করা যায় না। দৈহিক ও মানসিক, সকল শক্তি দিয়ে শুচিবাই প্রতিরোধ করা দরকার। উপযুক্ত ঔষধ-প্রয়োগে ভূতও পালায়। হিস্টিরিয়া সারানো সে তুলনায় এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে যাঁদের ঘর করতে হয়, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাকে সমর্থন করবেন।

শুচি-বাই যখন সবে শুরু হয়েছে, তখন দেখবেন অবস্থাটা প্রায়ই মৃদু এবং তার মধ্যে বিশেষ আপত্তিকর কিছু পাবেন না। ধরুন, কোনও এক মহিলা ঘর-দোর পরিষ্কার রাখতে ভালোবাসেন, অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন না। ধোপার বাড়ীর পাট-ভাঙা কাপড় পরেন না এবং নিত্যই সকলের ছাড়া কাপড় সাবান-সিদ্ধ ক'রে দুম্-দাম্ আছাড় দেন। বেলা দু'টোয় কাজ সেরে কোথায় দু'টো ভাত মুখে দেবেন, তা নয়। খাবার ঢাকা রেখে ঠাকুর-চাকরকে দ্বিপ্রহরের ছুটি দিয়ে তিনি ওপরে ওঠেন এবং ঘণ্টাখানেক নিজের ঘর-দোর-বিছানা পরিষ্কার করেন, যদিও চাকরে সে কাজ মোটের ওপর ভালই ক'রে রেখেছে।

টেবিল ঘষেন, ফার্নিচারে আঙুল দিয়ে দেখেন ধূলিকণার রেশ পাওয়া যায় কি না। কিছুতেই কারুর কাজ পছন্দ হয় না। মনে করেন সব অগোছালো, অপরিষ্কার। চায়ের বাসনে কোথায় একটি ছোট্ট কালো তিলের মতন দাগ লেগে রয়েছে, সেটা সযত্নে অণুবীক্ষণ করেন এবং আফসোস করেন চাকর বাকরদের দায়িত্বজ্ঞান নেই বলে। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে, তিনি ঝামেলা ভালবাসেন না, অকারণ চেঁচামেচি করেন না। যে কাজটি মনোমত পরিচ্ছন্ন হয় নি, সেটিকে তিনি নিজেই ক'রে নেন। ফলে বাড়ির ভৃত্য-পরিচারক দল গৃহিণীর সহিষ্ণুতায় ও স্বাবলম্বিতায় দিব্বি রামরাজ্যে বাস করে। বাইরে থেকে অতিথি-অভ্যাগত এবং আত্মীয়বর্গ এমন মহিলার ধীর-স্থির কর্মপরায়ণতার প্রশংসাই করবে। আমিও করব। কিন্তু গোপনে নজর রাখব—বাতিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি না। আমার মনে এ সংশয় থাকবে যে, এই ধরণের স্বভাব একটি নীরব ভূমিকা মাত্র। ভবিষ্যতে এ নিষ্ঠা সকলের অজ্ঞাতসারে হয়তো শুচি-বায়ুতে পরিণত হয়ে যাবে। তাই আমার দাওয়াই হল অন্য রকম। ঘরদোর, জিনিসপত্র আরো বেশি অগোছালো রাখতে হবে। ছাড়া কাপড়, বইয়ের স্তূপ, সিগ্‌রেটের ছাই, পানের বোঁটা, চূণের প্রলেপ, দাগ-ধরা চায়ের কাপ ইত্যাদির সাহায্যে অপরিচ্ছন্ন, অবিন্যস্ত বাড়িখানি রীতিমত গোয়াল ক'রে রাখা দরকার এবং দিনের পর দিন, ক্রমাগত। কত প্রতিবাদ, কত সংস্কার একটি মানুষ করতে পারে, করুক। বকা-ঝকা নয়, চেঁচামেচি নয়। প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় থাকতে হবে। তখন

ব্যাধি আপনা থেকেই কমতে শুরু করবে। ধৈর্যচ্যুতি ও শারীরিক অসামর্থ্য এসে এই শুচিতার আসক্তি দূর করবে। কিছু সময় লাগবে, কিন্তু ফল অবশ্যম্ভাবী। আমি এ ব্যাপারে কোনও গাফিলতির প্রশ্রয় দিতে চাই না। কেননা, চল্‌তি ভাষায় যাকে 'ছুঁচি-বাই' বলা হয়, সেটা প্রথমে ছুঁচই হয়ে প্রবেশ ক'রে ফাল হয়ে বেরিয়ে আসে।

শুচি-বাইর মধ্যে স্তর ও প্রকারভেদ আছে। আর সে সব স্তর এত সূক্ষ্ম আর প্রকারে এত বৈচিত্র্য যে, শুচি-বাইর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা রীতিমত গবেষণা-সাপেক্ষ। মোটা-মুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে জাতিগত, বিষয়গত এবং মাত্রাগত বিভেদ আছে। যেমন পুরুষের ও স্ত্রীলোকের শুচিবায়ুর মধ্যে টেকনিকের পার্থক্য আছে। এটা হল জাতিগত প্রকারভেদ। আবার বিষয়গত শুচিবায়ু আছে, যেমন কারুর আপ্রাণ দৃষ্টি উচ্ছিষ্টদোষে, আবার কারুর বা ধ্যানতন্ময়তা শৌচাগারের শুচিতায়। এ ছাড়া মাত্রাগত পার্থক্য সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা স্পর্শদোষে কেবলি হাত ধোন, কেউ বা কাপড় ছাড়েন, কেউ বা শীতের রাত্রেও স্নান ক'রে ফেলেন। মোট কথা, ডিগ্রীর তফাৎ। অশুচির ভয়ে কোনও লোক চৌকাট ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকেন না, কেউ বা বাড়ির সদর দরজায় উঁকি মেরে সরে পড়েন। আগন্তুক ঘরে এলে কোনও মানুষ দশ হাত দূরে প্রথম দুই সারি চেয়ার বাদ দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে বসতে অনুরোধ করেন। আবার কেউ বা সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, পাছে কিছু গায়ে বা হাতে লেগে

যায়, সেই ভয়ে আড়ষ্ট নির্জীবের মতন অন্যমনস্ক কথা বলেন। আর একটি কথা, হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রম আছে। শুচিবায়ুর অলিখিত আইন-কানুনেও তেমনি চারিটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হল ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ শুচিবায়ুর এপ্রেন্টিস্‌গিরি। তখন বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ শুচিতার মাহাত্ম্য কীর্তন চলে। পবিত্র জীবন ও পবিত্র আচরণ, এক কথায় সর্ব প্রকার মালিন্যবর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা ও সমর্থন প্রকাশ পায়। এ অবস্থা হল শুচিবায়ুর বীজ। সর্বদাই একটা সন্দেহ, খুঁতখুঁতে মন আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও সংস্কার করবার অদম্য স্পৃহা। এখানে গোড়াতেই কোপ মারা দরকার, সে কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গার্হস্থ্য শুচি অর্থাৎ ঘরোয়া শুচিবাই। এটা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে এ অবস্থায় মজাও যেমন, দাম্পত্য অশান্তিও তেমন। ঠাকুর-ঘরে ব্যভিচার চলুক, আপত্তি নেই। বৎসরান্তে সন্তানের জননী হতে বাধাও নেই। তবে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি না হলেই হলো। আঁতুড় ঘরে আর এঁটো বাসন তোলবার সময়ে যেন ময়লা ন্যাতাখানি ভালো ক'রে নাকের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নেওয়া হয়। তৃতীয় স্তর হল বাণপ্রস্থ। অর্থাৎ গোবর-চর্চিত গঙ্গাজল-ছড়ানো ঘরদোরে বিশ্বাস নেই। তাই তেতলার চিলে-কোঠায় অথবা বাড়ীর প্রান্তসীমায় সন্তর্পণে বাস অথবা ৺কাশীধামের ঘাটে গামছা-জড়ানো দেহে আকণ্ঠ অবগাহন। এটা হলো শুচিবায়ুর নগ্‌ডাস। তারপরই চতুর্থ স্তর অর্থাৎ তুরীয় অবস্থা। মানে—

স্পর্শাশৌচ ও মালিন্যভয়ে বসন-ত্যাগ। গোবর ও গঙ্গাজলের লোটায় দু'টি হাত বুড়িয়ে তৈলঙ্গ স্বামীজির মতন জুলজুল্ ক'রে চেয়ে বসে থাকো। দেহ অস্থিসার। আহারে, বসনে, শয়নে, স্বস্তি নেই। কেবল উপু হয়ে বসে থাকা, নড়া-চড়া না করা এবং ঘর-সংসার জ্বালিয়ে নিজে জীবিত-মৃত অবস্থায় শেষ দিনের সর্ব-পাবক অগ্নিস্পর্শের প্রতীক্ষায় ভূত অথবা পেত্নীর মতন নরক-যন্ত্রণাভোগ।

এবারে কয়েকটি উদাহরণ দিলে শুচিবায়ুর কমেডি ও ট্র্যাজেডি দু'টো চরিত্রই পরিস্ফুট হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে মজার জিনিস হলো—একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ আর একজন সগোত্র সহধর্মীর আতিশয্য নিয়ে হাসি-তামাসা করে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—একই সংসারে দু'জন বাতিকগ্রস্ত মানুষ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। যাঁর শুচিবাই আছে, তিনি বাড়ির মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ দর্শনীয় বস্তু। তাই রক্ষে। নইলে ধরুন স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বাতিকগ্রস্ত হলে সংসার মধুময় হয়ে উঠত! একটিমাত্র ব্যতিক্রমের কথা আমি জানি, যেখানে দু'জন শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের মধ্যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, আবার প্রয়োজন মত উভয়ের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হত। উভয়েই রমণী এবং বিধবা। তাঁদের কথা পরে বলছি। সে অতুলনীয় যুগ্মচরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে আমার নিবন্ধ শেষ করব। আপাততঃ পুরুষের শুচিবাইর কথা ধরা যাক্। দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এক ভদ্রলোককে অনেক দিন থেকে জানি, যাঁর সমস্ত

সাধনা, সময় ও শক্তি নিযুক্ত হয়েছে স্নানের ঘর এবং শৌচাগারের তত্ত্বাবধানে। সকালে উঠে কোনও কাজ তিনি করেননি এবং করতে পারেনও না। যেহেতু চা-পান পর্ব চুকে গেলে, তিনি খবরের কাগজ পড়েন আর বাথরুমে প্রবেশ করবার সাধনা করেন। কল খোলা থাকে, তারি নীচে থাকে বালতি। সে বালতি মাটিতে ঠেকে থাকতে পায় না, কারণ মেঝের ওপর দিয়ে জমাদার তো হেঁটে যায়। যদিও ভোরে জমাদার কাজ ক'রে যাবার পর ওরকম পাঁচ সাত বালতি ফিনাইল-গোলা জল দিয়ে সমগ্র বাথ-রুমের মেঝে এবং প্রায় তিন হাত উঁচু দেয়াল পর্যন্ত সযত্নে ধুয়ে ফেলা হয়। তা হোক্, কলের গায়ে দড়ির ফাঁস-জড়ানো বালতি ঝোলে এবং জলপূর্ণ হলেই তিনি যেখানেই থাকুন, দড়ি-ছেঁড়া হয়ে বাথ-রুমে ঢোকেন এবং সন্তর্পণে সেই জল ড্রামে ভরে নেন। এইভাবে দু'টি ড্রাম পূর্ণ করা হয়। একটির মুখ ঢাকা ও চাবি-বন্ধ। সে জলে তিনি মুখ ধোন ও বার বার কুলকুচো করেন। দ্বিতীয় ড্রামটিতে একটি বড় পিতলের থালা চাপানো থাকে। এ জল অব্রাহ্মণ। অর্থাৎ হাত-পা ধোয়া এবং অন্যান্য কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সকালে জল ধরা না হয়, ততক্ষণ তিনি এতই উচাটন থাকেন যে, শ্রীরাধিকাও কৃষ্ণের বংশীধ্বনির জন্যে এতটা উদ্গ্রীব থাকতেন না। ড্রাম দু'টিও মাটিতে থাকে না, তাদের জন্যে হাত দুয়েক উঁচু কাঠের একটি সিংহাসন আছে। সেখানে কৃষ্ণ-বলরামের মতই যুগল মূর্তি বিরাজ করে। জলপাত্রগুলি ধরণীর স্পর্শ বাঁচিয়ে আপনার

শুচিতা রক্ষা করে। যাতে কোনও জলের ছিটে না লাগে, জমাদারের ঝাড়ু তাড়নায় দু'এক ফোঁটা জল যেন ওপর দিকে ছিট্‌কে না যায়, তারি জন্যে এই হুঁশিয়ারি। যেদিন জল কম থাকে, সেদিন বাড়ীতে খিটিমিটি ও অশান্তি। চাকর-বাকর ও গৃহিণী সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। ইলেকট্রিক পাম্প খোলা, বন্ধ করা, বালতি ও ড্রাম ভরা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারুরই কোনও কাজে মন বসে না। এটা হল উদ্যোগপর্ব। তারপর বাথরুমে প্রবেশ। সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণপর্ব সেরে কুরুক্ষেত্র জয় ক'রে যখন শান্ত ক্লান্ত মূর্তিখানি বেরিয়ে আসে, তখন শান্তিপর্বের সূচনা। ঝাড়া তিন ঘন্টা, তার কম তো নয়ই। পৃথিবী রসাতলে যাক্, বাথরুম থেকে বেলা এগারটার আগে তাঁর বেরিয়ে আসা কল্পনা করাও যায় না। দু'দু'বার বড় রকমের ভূমিকম্প হয়ে গেল, কিন্তু দেবতা স্বস্থানচ্যুত হননি কদাচ। বিকালেও ঠিক দু'টি ঘন্টা কম ক'রে। এই রকম প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মিলে পুরোপুরি পাঁচ ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়। একবার হিসাব ক'রে আত্মীয়স্বজন দেখেছিলেন গত তিরিশ বছরে গড়পড়তা পাঁচ ঘন্টা দিনপিছু ধরলে জীবনের, মানে সজ্ঞান জীবনের, একতৃতীয়াংশ কাল কেটেছে তাঁর বাথরুমে। এর জন্যে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ঝড় গিয়েছে, কিন্তু তিনি টলেননি। বাইরে বেরুতে পারেন না, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-বর্গের প্রতি সামাজিক অকর্তব্য হয়। কিন্তু তিনি নিরুপায়। সরকারী চাকরি আর বাকি সময়টা বাথরুম, এই ক'রে তাঁর

ষাটের ওপর বয়স হয়েছে। সকাল থেকে জল-জল ক'রে উদ্বেগ, কেউ ড্রাম খুল্‌ল কিংবা ছুঁয়ে ফেল্‌ল, কল খোলা আছে এবং তাতে জলের ছিটে উঠছে, এই সব দুশ্চিন্তায় তিনি অন্য কোনও কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন না। বাথরুম থেকে না বেরুনো পর্যন্ত কেউ তাঁর সঙ্গে দরকারি কথা বলতে সাহস পায় না, এমন কি চেক্ সই করা পর্যন্ত মুলতুবি রাখতে হয়। গৃহিণী মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেন। খিটিমিটি শুরু হয়। ভদ্রলোক রাগ ক'রে উপবাস করেন। নয়তো বলেন, 'একদম রাস্টিক্। নোংরা ভূত সব!' মেয়ে, পুত্রবধূ, জামাই ও ছেলে পালা ক'রে এসে রাগ ভাঙ্গাবার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, 'নাঃ, আর এখানে থাকা অসম্ভব। আমি কালই হরিদ্বারে সরে পড়ছি। নির্বোধ স্ত্রীলোক জানে না, যে ডালে বসে আছে, সেই ডালেই কোপ্ মারছে। আমি হরিদ্বারে চলে গেলে বুঝবেন বাছাধন···যদ্দিন হাতীর মতন রোজগার ছিল, তদ্দিনই আমার খাতির ছিল। আর আজ···' গৃহিণী হো-হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দেন, বলেন, 'হরিদ্বারে জলের ড্রাম্ আর বাল্‌তি ল্যাগেজ ক'রে পাঠাতে হবে তো!' যাই হোক্, পরের দিন রাগ পড়ে যায়। আবার বাথরুম থেকে 'ওগো' 'ওগো' ডাক আসে। 'ওগো' বিস্রস্তবেশে সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটেন। দরজার ফাঁক দিয়ে সিগ্‌রেট, টুথব্রাশ, খড়কে অথবা পা-মোছার গামছা সরবরাহ করেন। যেদিন নটা সাড়ে নটায় তাঁকে বাইরে বেরুতে হয় বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে, আগের রাত থেকেই বাথরুম

পরিষ্কার ও জল-সঞ্চয়ের তোড়জোড় চলে। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা হয়, যাতে রাত চারটেয় তিনি নির্বিঘ্নে শৌচাগারে প্রবেশ করতে পারেন। এই বাথরুমে তিন ঘণ্টা কাটানোর জন্যেই তাঁর দু'তিনবার ট্রেন ফেল হয়েছে। স্টিমারের ভোঁ দিয়েছে, ছেড়ে গিয়েছে, কিন্তু খড়কে দিয়ে নখ ও দাঁত খোঁটা, পায়ের তলায় সপ্তমবার সাবান ঘসা তাঁর বন্ধ হয়নি। এই বাথরুম পর্বের জন্যই তিনি যথাসময়ে পাত্র আশীর্বাদ করতে বেরুতে পারেননি। লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অবশেষে ভিন্ন দিন স্থির ক'রে মেয়ের বিয়ের দিন পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হয়েছে। তাঁর চরিত্রে দু'টি গুণ আমায় মুগ্ধ করে। স্ত্রীজাতির উপর তাঁর প্রচুর অনুকম্পা অথচ আপনার স্ত্রীর উপর প্রচুর দাবী। তিনি স্ত্রী-পালিত আদর্শ স্বামিদেবতা। আর দ্বিতীয়টি হল শুচিতার ওপর তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। যে যাই বলুক বা ভাবুক, তাঁর শুচিবায়ু তিল পরিমাণেও কমে না। ড্রামের বরাদ্দ জল এক ইঞ্চিও কমে না। অসহায়, পরমুখাপেক্ষী, শুচিগ্রস্ত গৃহস্থ কেমন ক'রে গার্হস্থ্য জীবন এতদিন পালন ক'রে এলেন, অথচ স্বধর্ম এবং স্বাধিকার থেকে বিন্দুমাত্র প্রমত্ত হলেন না, এইটে ভাবলেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। দূর থেকে তাঁকে মহাপুরুষ-জ্ঞানে আমি প্রণাম জানাই। তাঁর এই দুর্বলতার কথা সকলেই জানে। কিন্তু কেউই তাঁকে অশ্রদ্ধা করে না। এক স্ত্রী ছাড়া প্রত্যেকেই তাঁকে সমীহ ক'রে চলে। সমাজেও তিনি বুদ্ধিমান্, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সজ্জন হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আর একজন ভদ্রলোকের কথা বলি এবার। তিনি কাজ-কর্ম করেন, সংসার চালান, সমাজে চলাফেরা করেন। কিন্তু কি দুঃখে তাঁর জীবন কাটে, দেখলেও দুঃখ হয়। তিনি দু'টি হাত সমস্তক্ষণ গুটিয়ে উঁচু ক'রে থাকেন। কোনও জিনিস ছুঁতে পারেন না। কোনও বাড়ীর দরজার সামনে ঠায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ হয়ত দেখতে পায়নি তাঁকে। তিনিও হাত দিয়ে ফটক খুলতে পারছেন না অথবা কলিং বেল্ টিপতে পারছেন না। অদৃশ্য বীজাণুই তাঁর কাল্পনিক শত্রু। কোনও কিছুতে হাত ঠেকে গেলে অন্তত আধ ঘণ্টা-কা'ল লাইফবয় সাবান দিয়ে হাত ঘষেন। তারপর পটাশ পা'রমাং-জল এবং তারও পরে ডেটল দিয়ে হাত ধুতে হয়। যতক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলে, পাশে একজনকে জলের বৃহৎ জ্যগ্ নিয়ে মোতায়েন থাকতে হয়। অন্য কোন বিষয়ে তাঁর শুচিবায়ু নেই। মানে, ঐ একটি কাজেই তাঁর এত সময় ও চিন্তা ব্যয়িত হয় যে, দ্বিতীয় দিকে মন দেবার তাঁর অবকাশ থাকে না। মানুষ চমৎকার। নীরব, ভদ্র, সহিষ্ণু এবং আত্মত্রুটি-সচেতন। কেউ কিছু অনুযোগ করলে তিনি আত্ম-ক্ষালন করেন না। নীরব হাসি হেসে রুটিন-মাফিক হস্ত প্রক্ষালন করেন মাত্র। তিনি যে কাজ করেন, তাতে এ শুচি-বায়ু তেমন ক্ষতি করতে পারে না। কেবল দিনের অধিকাংশ কাটে দাঁড়িয়ে, এই যা। হাত গুটানোই থাকে, আর পরনের কাপড়ও হাঁটু অবধি তোলা। তবে তিনি যদি ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক অথবা ব্যবসায়ী হতেন, তিনি কি করতেন তাই

ভাবি। হয়তো কাজ ছেড়ে দিতেন। প্রফেশ্যনল মানুষ হলেই কত লোকের সঙ্গে মেশামেশি, একত্র বসা ও চলাফেরা করতে হয়। তাঁদের কেউ যদি স্পর্শদোষের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকেন, তাহ'লে রুগী, মক্কেল, ছাত্রদল কি করবে তাঁকে নিয়ে ?

স্ত্রীলোকের শুচিবাই ঐ বায়ুরোগ হলেও তার তীব্রতা এবং ভয়াবহতা অনেক, অনেক বেশি। প্রথম কথা, মহিলারাই গার্হস্থ্য জীবন সচল রাখেন। তাঁদের সুস্থ মন ও দেহ নিয়েই সংসারের শ্রী ও কল্যাণ। তাঁরা যদি কেউ বায়ুগ্রস্ত হন, তাহ'লে সংসার শুধু অচল নয়, নষ্ট হয়ে যায়। পরিবেশ বিশ্রী হয়ে যায়, সংসারে আসে দারিদ্র্য, জীবনে নামে সন্দেহ-অশান্তির কদর্য গ্লানি। সকৃড়ি, ময়লা, বাসন, কাপড়-কাছা, কলতলা আর আঁস্তাকুড় পরিষ্কার করতেই সূর্য চলে যায়। জীবনের সূর্যও নিভে যায়। সংসারকে ঘিরে থাকে নিত্য অমা-রজনী। এ জীবন নিরর্থক। যিনি শুচিবায়ুগ্রস্তা, তিনি বুঝেও বোঝেন না। অবুঝের মতন ধোপার বাড়ীর কাপড় আবার ধুয়ে নেন, সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে বেড়ান, এঁটোর ভয়ে আড়ষ্ট থাকেন, স্বামি-সন্তানের স্নেহ-সেবা-বঞ্চিত হন। এর চেয়ে আফসোস আর কিছু নেই। এ অবস্থায় বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। তিনি নিজে জীবিত থেকেও মৃতবৎ। আর যাঁদের নিয়ে তাঁর সংসার, তাঁদেরও জীবন্ত মরণ। খেয়ে সুখ নেই, কোথায় এঁটোর দাগ লাগল। বিধবা হলে তো কথাই নেই। এঁটোর মধ্যেও আবার জাতিভেদ আছে। লক্ষ্মীর

দ্রব্য সিদ্ধ হলে উচ্ছিষ্ট, অপক্ক অবস্থায় অনুচ্ছিষ্ট। কাষ্ঠাসনে দোষ নেই, শুদ্ধ বস্ত্রে দোষ নেই। কিন্তু মৃত্তিকায় স্পর্শদোষ এবং সুতির কাপড়ে ছোঁয়া লাগলে ছেড়ে ফেলতে হয়। কোন্ স্পর্শে গোবরজল, কোন্‌টায় গঙ্গাজল, কোন্‌টাতেই বা সর্বাঙ্গ-স্নান সুচিত হয়, তার মেয়েলি শাস্ত্রই আলাদা। তার ওপর বিধবার পক্ষে আমিষ বিচার। মাছ কুটতে দোষ নেই, কিন্তু থালায় লাগলে দোষ। তা'ছাড়া, আছে পেঁয়াজ, মশুর ডাল পাঁউরুটি এবং পুঁইডাটা অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের স্পর্শ-দোষ। মেঝেতে এঁটো বাসন পড়ে থাকলে কতদূর পর্যন্ত পাড়তে হয়, গোবর-ন্যাতায় পুঁছতে হয় অর্থাৎ জননী ধরিত্রীর কতটা অংশ স্পৃষ্ট ও উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় তার পৃথক্ আইন-কানুন মেনে চলতে চলতে বাজি ভোর! কেউ বা অল্পে সন্তুষ্ট। কেউ বা সংলগ্ন দ্রব্য, দেওয়াল, দরজা, জানলা পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে বলে ধোলাই করেন। সধবা শুচিবায়ুগ্রস্তা হলে স্বামীও উচ্ছিষ্ট বস্তু বলে ধোলাই হতে পারেন। শুচিবায়ুর এলাকা কতদূব গড়ায়, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গল্পকথা নয়।

কোনও এক মহিলার সন্দেহ এবং শুচিবাই দুই রোগই ছিল। আমাদের দেশের লোক, কাজেই সংবাদটি নিছক সত্য। ভদ্রমহিলা অসমসাহসী পল্লী-রমণী, একাই থাকতেন। স্বামী বিদেশে কাজ করতেন, ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসতেন। এঁকে আমরা সুরোর মা বলে জানতাম বাল্যকালে। তাঁর সর্বপ্রধান গৌরবের বস্তু স্বামিসৌভাগ্য নয়, সংসারের স্বচ্ছলতা নয়, সন্তান-গৌরবও নয়, শুচির পরাকাষ্ঠাই ছিল

তাঁর দম্ভের সামগ্রী। তিনি সঙ্গিনীদের কাছে গর্ব ক'রে বলতেন, 'বেটাছেলে আছ, স্বামী হয়েছ, তাতে এত খাতির কিসের? হাত-পা ধুয়ে মটকার কাপড় পরে গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে যদি ঘরে না ঢোকে, ঘরেই ঢুকতে দিই না। এক বিছানায় শোয়া তো দূরের কথা। মিন্‌সে একদিন ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুলছিল। ঘেন্নায় মরি। অত রাত্তিরে গঙ্গাজল্ দিয়ে গড় গড় ক'রে কুলকুচো করাই, তবে শুতে দিই। কিন্তু সেই থেকে ভাই মুখের কাছে মুখ আনতে দিই না……।' সঙ্গিনীরা হেসে বলতেন, 'তা বেশ কর, দাও না। কিন্তু বলি, কোলেরটি এল কি ক'রে?' স্বামীকে তিনি অশেষ প্রকার নির্যাতন করতেন। বাইরে থেকে বেড়িয়ে এলে, সন্ধ্যা হোক আর রাত্রিই হোক, স্বামীকে রোয়াকের নীচে প্রথমে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে গলা-খাঁকারি দিয়ে জানাতে হত, বান্দা উপস্থিত। তারপর স্ত্রী হেঁসেল থেকে বেরিয়ে গোবরজল-গোলা বালতিটি উপুড় ক'রে ঢেলে দিতেন স্বামীর অঙ্গে। জামা-কাপড় আলগোছে তুলে নিয়ে পরনের পোষাক ছেড়ে তবে তিনি সিঁড়িতে পা দিতে পারতেন। অথচ এই স্বামীর ওপর তাঁর মালিকানা স্বত্ববোধ ছিল ষোল আনা। আত্মীয়া হলেও অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কথা বলার সাহস তাঁর ছিল না। একে শুচিবায়ু, তায় ঈর্ষ্যা। সোনায় সোহাগা। বালবিধবা এবং সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি রমণীর শুচিবায়ুর উদ্ভব কোন্ নিরুদ্ধ মনোবৃত্তি অথবা অবচেতন মানসের প্রতিফলন এবং তার মধ্যে বিকৃতি অথবা যৌন-রহস্য

কতখানি, সে খবর ফ্রয়েডীয় দর্শনতত্ত্বই বিশ্লেষণ ক'রে বলতে পারে। আমরা সাধারণ মানুষ দেখি, আর অবাক্ হয়ে থাকি।

বাল-বিধবার শুচিবাই প্রসঙ্গে দু'টি অমর চরিত্রের কথা মনে পড়ল। তাঁদের চরিতকথা বর্ণন আমার লেখনীর অসাধ্য। শরৎচন্দ্র যদি তাঁদের একবারটি দেখতেন, তাহ'লে 'বামুনের মেয়ে' নতুন করে লিখতেন, এইটুকু বলতে পারি। মাতুলালয়ের অতি নিকটেই এই দু'টি বিধবা বাস করতেন একখানি পুরাতন জীর্ণ বাড়িতে। এককালে এঁরা খুব বড়মানুষ ছিলেন। কিন্তু সব নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষের মধ্যে কেউ বেঁচে ছিলেন না। কেবল ঐ দু'টি বিধবা প্রেতরাজ্যের অন্ধকারে বাস ক'রে নিজেরাই প্রেতিনী হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ী থেকে গঙ্গা মিনিট দশেকের পথ। কাজেই গঙ্গাতীরে বাস করার অশেষ পুণ্যফলে তাঁদের বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ, দুইই একদম শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু বা সন্দেহ ছিল, সেটুকু দু' বেলা খেয়ে উঠে বিশ্রাম-অবসরে পরচর্চা ক'রে পরস্পব পুষিয়ে নিতেন। এঁদের সম্বন্ধে আর দু'টি তথ্য আপনাদের জানা প্রয়োজন। প্রথম কথা, এঁরা সম্পর্কে ননদ-ভাজ। দু'জনের মধ্যে যেটুকু অসদ্ভাব বা অবনিবনা, সেটুকু দুই স্ত্রীলোকের একত্র বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু দু'জনেরই যেটি সাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য, সেটি হল অসম্ভব রকমের শুচিবায়ু। এই পয়েণ্টেই তাঁদের গভীর মিল ও সখ্যভাব। ঠাকুরঝি যখন চারদিকে গোবরছড়া ছিটোতে থাকেন, ভাজ ঠাকুরুণ তখন ঝাঁ ক'রে গোবরের একটি বড়ি পাকিয়ে

আলগোছে মুখে ফেলে গিলে নেন। ঠাকুরঝি দেখেন বাইরের পবিত্রতা, ভাজ দেখেন ভিতরের। পাকস্থলীতে উচ্ছিষ্ট থাকে। অতএব জীর্ণ হবার পূর্বেই তাকে শুদ্ধ ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা, এঁরা ত্ব'জনেই বিষকুম্ভা কিন্তু পয়োমুখী। ছোট-বেলায় একজনকে আমরা মামীমা বলে ডাকতাম, আর এক-জনকে মাসিমা। বাড়ীর যিনি গৃহিণী ছিলেন, সেই বৃদ্ধাকে বলতাম দিদিমা। কিন্তু এই ত্ব'টি শুচিবাই-পীড়িত অর্ধোন্মাদ রমণীকে দিনের পর দিন চালানো যে কি ত্বরূহ এবং হৃদয়-বিদারক ব্যাপার, তার বহু দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। শান্তশ্রী নিরীহ বৃদ্ধা কন্যা আর পুত্রবধূর হাতে কিভাবে লাঞ্ছিত হতেন, তা আর বলবার নয়। উভয়ের শুচি-দ্বন্দ্বে অর্ধেক দিন হাঁড়ি চড়ত না, বৃদ্ধা উপোস দিতেন। তার ওপর সন্দেহবশে অনেক সময়ে বুড়ীকে গঙ্গাস্নান করতে হত। যখন শরীরে আর সামর্থ্য রইল না, তখন তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোঙাতেন, 'ওরে তোরা আর চুলোচুলি করিস নি। একবার এদিকে আয়, আমাকে সরিয়ে দে···' তাঁরা ভালো করেই সরিয়েছিলেন। এক শীতের সন্ধ্যায়, শয্যা অপবিত্র হয়েছে মনে ক'রে পুকুরে ডুবিয়ে আনলেন। মাত্র তিনটি দিনের ওয়াস্তা। বেঘোর জ্বর ও বুকে সর্দি নিয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধা ভবধাম ত্যাগ করলেন এবং বোধ করি শুচিপরায়ণা কন্যা আর পুত্রবধূর পিছু-তাড়ার ভয়ে স্বর্গে আর গেলেন না। রোগে বুড়ী যখন অচেতনপ্রায়, তখন ননদ-ভাজে পরামর্শ করছেন, কেমন ক'রে ওঁকে চান্দ্রায়ণ ও বৈতরণী করানো যায়। বুড়ীর

কানের কাছে যখন দু'জনে চেঁচিয়ে সে প্রস্তাব জানালেন, তাঁর রোগপাণ্ডুর শীর্ণ মুখে একটু হাসির রেশ দেখা গেল। তিনি বললেন, 'ও সবে আর দরকার নেই। তোদের জন্যে তো চাই……নিজেরাই ক'রে-কম্মে নিস। এবার হাড় জুড়োতে দে।' মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলাম। বুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে মরছেন এবং ওপার থেকে তাঁর ছেলে ও জামাই তাঁর শুচিনরক থেকে উদ্ধারের প্রতীক্ষা করছেন।

ননদ ছিলেন বয়সে বড়। কিন্তু শুচি ও আচারে ভাজ ছিলেন সিনিয়র। বেগুন পোড়ান হবে কি না, চাল সিদ্ধ করা চলবে কিনা, কাপড় বদলান দরকার কিনা, ইত্যাদি দৈনন্দিন সমস্যায় ননদ শিষ্যার মতই প্রশ্ন করতেন। ভাজ পোপের মতই শুচিরক্ষা ক'বে মধ্যযুগীয় নির্দেশ দিতেন। ননদ ছিলেন শ্যামবর্ণা। একটু মোটা-সোটা, মাথায় চুল আর পরনে খাটো থান। সে থান অধিকাংশ সময়েই উরুর উপরে ওঠানো থাকত। ভাজ ছিলেন গৌরবর্ণা। ছোট ছোট ক'রে চুল কাটা, দেখলে মনে হত, একটি সুন্দব কিশোর। কোমরে কখন-সখনও একখানা গামছা জড়ানো থাকত, কখনো কিছুই নয়। যেদিন খিড়কির পুকুরে অবেলায় স্নান করতে যেতেন, সে সময়ে প্রতিবেশীরা লজ্জায় সে দিক মাড়াত না। উভয়ের জীবন-প্রণালীর প্রতিটি খুঁটি-নাটি এবং দৈনন্দিন রুটিন সকলের মুখস্থ ছিল। বাড়ীর ত্রিসীমানায় কোনও কুকুর, গরু, ছাগল ঘেঁষতে পেত না। প্রতিবেশী কামাখ্যানাথের দুরন্ত নাতির

একটি পোষা বিড়ালের দৌরাত্ম্যে ব্যথিত হয়ে একবার দু'জনে সমস্বরে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সর্বশুচি ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী-মাতার কাছে কাতর নিবেদন জানিয়েছিলেন যেন তে-রাত্তির না পেরোয়—এ অনাচারের একটা বিহিত হয়। জাগ্রত দেবী কথা শুনেছিলেন এবং তৃতীয় দিনের ভোরবেলায় বালকটি অকস্মাৎ ধনুষ্টঙ্কারে প্রাণত্যাগ করে। এর পর লোকে আর কিছু করতে সাহস করে নি। সবাই জানত, এঁরা সিদ্ধ-নারী। রসনায় আছে বিষ, যদিও সামাজিক আলাপের কৃত্রিম শিষ্টাচারে এঁদের বাক্যে মধু ক্ষরণ হত। কিন্তু সে কথা থাক। ননদ-ভাজের শুচিবাই-এর কয়েকটি কাহিনী শোনাই।

শুচি অশুচির ব্যাপারে ননদের তবু মাঝে মাঝে সন্দেহ হত। কিন্তু ভাজের মনে সন্দেহ বলে কোনও সমস্যার উদয় হত না। সে মন ছিল নিশ্চিত, প্রত্যয়শীল এবং কঠোর। অশুচির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনায় তাঁর মন আগে থেকে তৈরি থাকত এবং অশুচি স্পর্শ ঘটবার পূর্বেই তিনি নির্মম বিধি-পালনে তৎপর হতেন। তবে ননদের খাতিরে মধ্যে মধ্যে তাঁকে রেহাই দিতেন। করুণাপরবশ হয়েই বলতেন, 'তোমার দু'দিন উপোস গেছে ঠাকুরঝি। সামলাতে পারবে না। তুমি আজ মাঝের হাঁড়িতে দু'টো চাল ফুটিয়ে নাও। আজ আমার হরিমটর·· ···'
এখানে আপনাদের অবগতির জন্য বলতে হয় যে, হেঁসেলে মাত্র একটি হাঁড়ি থাকত। সেটি পবিত্র অর্থাৎ যেদিন নিঃসংশয়ে শুচিতা বজায় আছে, সেদিনের রান্না ঐ পাত্রে। হেঁসেলের বাইরে এক কোণে একটি কালো হাঁড়ি, সেটি হল অশুচি হাঁড়ি।

ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর বারান্দার শিকেয় ঝুলত একটি পিতলের তিজেল হাঁড়ি। সেটি হল সন্দেহ-হাঁড়ি। যেদিন সন্দেহের কারণ ঘটত, গঙ্গাস্নানের পর পথে কার আঁচল গায়ে ঠেকল কি ঠেকল না বলে মনে হত, সেদিন ঐ মাঝের হাঁড়ি নামানো হত। নিজেদের কোনও নিকট আত্মীয় ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠাবতী রমণীরা দূর জ্ঞাতি-জনের জনন ও মরণাশৌচ পালন করতেন। ও বাড়ীর মোতিলাল যখন মারা গেল, এ বাড়ীর মাসিমা গেলেন সান্ত্বনা দিতে। মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় শয্যার একপ্রান্ত উঠোনের বেড়ায় একটু লেগে গিয়েছিল। সমস্ত বেড়া উপড়ে ফেলে জ্বালানি কাঠ করা হল মাসিমার নির্দেশে এবং সমগ্র উঠোন গোবর-গঙ্গাজল দিয়ে নিকানো হল। মামীমা যান নি, তিনি বাড়ীতে থেকেই নিয়মব্যবস্থা করছিলেন। একটি মেটে মালসায় আগুন ক'রে আর একটি ভাঁড়ে পবিত্র গোময়মিশ্রিত গঙ্গাজল রেখে দিলেন ননদিনীর দেহশুচির জন্যে। মধ্যে মধ্যে কমপিটিশ্যন্ চলত মজার। এ ঘর থেকে ননদ একটা কিছু আচার নির্দেশ দিলেন হয়তো অনুচ্চকণ্ঠে। ও ঘর থেকে পাল্টা জবাব দিলেন ভাজ তারস্বরেই। একদিন বারান্দা দিয়ে যাচ্ছেন ননদ। হঠাৎ দখিনা বাতাস অমন নীরস শুচিকঠোর মহিলার সঙ্গে একটা বদ রসিকতা ক'রে বসল। দম্‌কা হাওয়ায় তাঁর লম্বা চুলগুলি তুলে উঠল এবং রুক্ষ তৈলহীন বলেই বোধ হয় একটু উড়ল ফর ফর ক'রে। মলয় বায়ু শুচিবায়ুর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? নিমেষে তার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ ক'রে মাসিমা একটু থামলেন।

তারপর একখানা নড়বড়ে কাঠের চৌকি এনে তার ওপর কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ ছোট ক'রে, ভুরু কুঁচকে অতি পরিপাটি-ভাবে দীর্ঘতম কেশ কয়টি বেছে নিয়ে শিকেয় ঝোলানো সন্দেহ-হাঁড়ির দিকে তুলে ধরলেন। ঠিক পৌঁছুল না। তখন সেই টলটলায়মান চৌকির ওপর অপঘাত মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে ডিঙি মেরে দেহটাকে উঁচু ও সটান ক'রে লম্বা চুল কয়গাছি ঊর্ধ্বে মেলে ধরলেন। এবার ভরসা পাওয়া গেল। নাগালের মধ্যে যখন পাওয়া গেল, তখন ঠেকলেও ঠেকতে পারে। অতি সন্তর্পণে নেমে এসে মাসিমা কঁ্যাচ ক'রে চুলগুলি কেটে ফেললেন। তারপর স্নান ক'রে এসে সন্দেহ-হাঁড়িটাই নামিয়ে নিলেন, কারণ এ সমস্যাকুল, মন নিয়ে হেঁসেল অপবিত্র করা কোনমতেই চলতে পারে না। মাসিমা আড়চোখে সবই দেখছিলেন। এ রকম নিষ্ঠা দেখে তাঁর কঠিন প্রাণও দ্রবীভূত হল। তিনি ঈষৎ স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, 'কতদিন বলেছি ঠাকুরঝি, ও পাপ বিদেয় করো। চুল থাকলেই জঞ্জাল। আমি তো কবে মুড়িয়ে ঘোল ঢেলেছি। তুমি আর কেন মায়া করছ?' কিসের যেন স্মৃতিতে মাসিমা একটু আনমনা হয়ে পড়লেন। জবাব দিলেন, 'তাই দেব লো বউ, দেব। তাতে পাঁজি মঙ্গলবার। প্রযাগে যাওয়ার কপাল আমার নয়। নিবে ছোঁড়াকে ধরে ত্রিবেণী গিয়ে ক্ষুর বুলিয়ে আসবো। নেহাৎ মা বেঁচে ছিল এতদিন, তাই…'

তারপর মামীমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ও কি হলো বউ। আজ আবার মাটীতে গর্ত করছিস কেন?'

মামীমা সলজ্জ হেসে বললেন, 'কিছু নয় ঠাকুরঝি,। সকালে কি যেন মাড়িয়ে ফেললুম ! সিধু গোয়ালা গরু নিয়ে যাচ্ছিল আগে আগে। কিন্তু আমার কপালে ও কি আর গোবর পড়ে থাকবে ? তা নয় ঠাকুরঝি। খানার ওপারেই দাঁড়িয়েছিল তুলসী ধোপানীর হতচ্ছাড়া গাধাটা। ওরই কম্ম নিশ্চয়ই··· এ অবস্থায় কি আর ঘরে ঢোকা যায় ! তাই উঠোনের এক কোণেই গর্ত ক'রে মাটীর নতুন সরায় দু'টো কাঁচা মুগের ডাল ফুটিয়ে নিই··· ভাবলুম চাল চড়ানো তো চলবে না।' 'ও মা, তাই তো বলি···' মাসিমা কণ্ঠে সোহাগের সুধা ঢেলে বললেন, 'সর্ তো বউ, কাঁচা নারকেল কাঠির ধোঁয়ায় চোখ দু'টো যে গেল ··আমি ফুঁ দিচ্ছি······সরে বোস্।' মাসিমা ফুঁ দিয়ে আগুনের তেজ বাড়ালেন। ডাল সিদ্ধ হল। নামিয়ে নিকানো মাটিতেই বিনা পাত্রে সরা উপুড় করা হল। মামীমা সোহাগের নাকি সুরে বললেন, 'তুমিও ভাত কটা বেড়ে এনে ঐ কোণটায় বসে যাও না কেন ?···'

ননদ-ভাজের আহার-পর্ব শুরু হল দেখে আমরা এবার সরে পড়ি, কি বলেন ? শুচিবায়ুগ্রস্তা অন্তঃপুরিকাদেব খাওয়ার সময়ে দাঁড়াতে নেই। দৃষ্টিদানেও অস্পৃশ্যতা লাগতে পারে। কিন্তু কলিকালে ননদ-ভাজের এই সম্প্রীতির অতুলন দৃশ্যে আপনাদের নয়ন ও হৃদয় কি মুগ্ধ হল না ? জল ঘেঁটে-ঘেঁটে মাসিমার হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি প্রায় সাদা হয়ে গেছে। গোবর-জলে আঠারো ঘণ্টা হাত ডুবিয়ে রেখে মামীমার কনুই পর্যন্ত হাজা ধরেছে। দু'জনে দুই কোণে বসে, একজন খাটো থান

পরে আর একজন বিনা বসনে, উপু হয়ে বসেছেন পিণ্ড-গ্রাসে। মধ্যে মধ্যে পুলককণ্ঠে পরচর্চার ঝাল-ফোড়ন। এ স্বর্গীয় দৃশ্য কোনও আধুনিক ননদ-ভাজ কল্পনাও করতে পারবেন না।

আমার এ লেখা শুচিবাই-পীড়িত মানুষের জন্য নয়। তাঁরা হাত দিয়ে কাগজ ছোঁবেন না, চোখ দিয়ে পড়লে গঙ্গাজলে চোখ ধুয়ে ফেলবেন জানি। কিন্তু আপনারা? বিশ্বাস করুন, এর প্রতিটি ছত্রে অবিমিশ্র সত্য। পড়ে যদি আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, তা হলে কাজ হয়েছে বুঝব। ঘরেতে কারুর যদি এ রোগের স্পর্শ লেগে থাকে, এই পাঁচালী শুনে সময় থাকতে সাবধান হোন—এই আমার আন্তরিক অনুরোধ।

প্রেমের গান

ভালোবাসাই না কি গান।

আকস্মিক উল্কার অগ্নিস্পর্শে অন্তর যখন রঙীন উদ্দীপনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখন সেই নবজীবনের প্রারম্ভই হয় অভিনব গান। হৃদয় তখন অদৃশ্য সুরে ভরপুর। নেপথ্যাচারিণীর সঙ্গীতময় অস্তিত্ব সংক্রামক ব্যাধির মতই অদম্য সঙ্গীতের সূচনা করে। আর সেই পুলকিত বেদনাবোধ অথবা বেদনাময় হর্ষ—যা আপনাদের অভিরুচি—হৃদয়ে, কণ্ঠে অথবা লেখনীতে স্বতঃ উৎসারিত সঙ্গীতস্পৃহা সঞ্চারিত ক'রে দেয়। প্রেম অবাস্তব পদার্থ অথবা তর্কনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ সত্য কি না, জানি না। তবে গানেই যে তার অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ, পরিণতি এবং হয়তো বা বিলুপ্তি—এটা প্রমাণিত তথ্য।

নিজে প্রেমে পড়ে দেখেছি। পরীক্ষা করবার জন্যে একটা সশ্রদ্ধ বিচারশীল মনোভাব নিয়ে এই বিশেষ মানসিক স্তরের সাধনা ক'রেও দেখেছি। গান ফুটে উঠবেই। প্রকৃতির অমোঘ বিকাশ-লীলার মতই গান হল ভালোবাসার স্বভাব-ব্যঞ্জনা। হয় কবিতা-রচনা, নয় গান-রচনা অনিবার্য তাগিদে এগিয়ে আসে। যে মানুষের সৃজনী প্রতিভা নেই, তিনিও একটি বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব অথবা চেতনা সৃষ্টি ক'রে নেন। তাতে মানুষকে বোকাই দেখাক আর উদ্দীপ্ত লাবণ্যময় ক'রে তুলুক, মানুষের প্রেম প্রকাশপথ খুঁজে নেবেই। পুরুষই

হোন, আর স্ত্রীলোকই হোন, কাউকে একবার ভালোবেসে দেখবেন—গান আপনাকে করতেই হবে। কবিত্বশক্তি যদি আপনার নাও থাকে, প্রক্সিতে অন্ততঃ কবি হয়ে যাবেন নিশ্চয়ই। অপরের রচিত গান আপনার খেয়াল ও খুশিমত শিক্ষিত অথবা অপটু কণ্ঠে গুনগুনিয়ে উঠবে। আর যদি অদীক্ষিত হৃদয়ে অশিক্ষিত কণ্ঠে গান উৎসারিত হয়ে না ওঠে, তা হলে নির্জন ছাদে, বাথরুমে অথবা যে কোনও জায়গায় শূন্য মনের বিষণ্ন অবসর-মুহূর্ত ভরে তুলবে অতি ক্ষীণ চাপা গলায় বেসুরো আওয়াজের নির্বোধ আনন্দ।

এস্থলে আপনি ও আমি নিরুপায়। ১৯১০ সালে কমলা অথবা তরুবালা হয়তো আধুনিকাদের মতন দুঃসাহসিক প্রেম করতে জানত না, বোধ করি ভরসাও পেত না। কিন্তু গুরুজনদের অনুপস্থিতিতে, চিলে কোঠায় লোকচক্ষুর অন্তরালে কুমারীর সদ্যোজাগ্রত বুভুক্ষা তাদের কণ্ঠে কি অদম্য গীতোচ্ছ্বাস এনে দেয় নি? আর যদি চৌদ্দয় পা দিতে না দিতেই, অভিভাবকের উদভ্রান্ত গরু খোঁজায়, গ্যাসের আলো আর ফুলের জটিল গন্ধাবেশে কোনও মনোমোহন অথবা চন্দ্রকান্তের কণ্ঠে তারা বরমাল্য অর্পণ করবার সৌভাগ্যলাভ করত, তা হলে তো আর কথাই নেই। গান তখন রোখে কে? চারুচন্দ্র দৌলতপুরে কলেজী ছাত্রই হোন আর সতীশচন্দ্র রাঁচিতে প্রবাসী চাকুরেই হোন, শোভনাবালা কিংবা বিভাবতী সন্ধ্যায় পরিপাটি চুল বেঁধে চাটাই খোঁপায় সোনার চিরুণির ওপরে বেলফুল গুঁজে, লেস-দেওয়া গোলাপী জ্যাকেট আর ফিরোজা

রঙের শাড়ী-সেমিজ পরে সমবয়স্কাদের সঙ্গে একজোটে, বিরোধী ঐক্যতানের অপূর্ব সমন্বয়ে 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার' কিংবা 'আজি এসেছি, আজি এসেছি বঁধু হে' প্রভৃতি নতুন-শেখা গানের আকুল আহ্বানে স্থানীয় আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলতেন নিশ্চয়ই।

বেশ মনে পড়ে—তখন বয়েস আমার দশ কি এগারো। এক সন্ধ্যাবেলায়, বাড়ীর এক কোণে ছোট্ট অপরিসর ছাদে, স্বামীর সঙ্গে সদ্য থিয়েটার দেখে-আসা কিশোরী দিদির সুমিষ্ট গলায় নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে মদন-রতির দুর্বোধ্য ফুলবাণের আকুল আকর্ষণ এবং মর্মান্তিক বেদনাটুকু তারস্বরে ঘোষণা করছিলুম—'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ-সমান।' এমন সময়ে অতর্কিতে অগ্রজের আবির্ভাবে ভগ্নীর সঙ্গীতস্রোত শুধু থেমেই গেল না—আমাকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ফেলে তড়িৎগতিতে আবছা অন্ধকারে তিনি ভোজবাজির মতই অদৃশ্য হলেন। কর্ণমর্দনের জ্বালাটা তীব্র হলেও ভুলেছি। কিন্তু সঙ্গীত-চর্চার সেই নিদারুণ মর্যাদাহানিকর প্রথম অপমান আজও বিস্মৃত হইনি। তারপর —জীবনে চাঁদ আরও উঠেছে; লুকোচুরি খেলে হৃদয়াকাশে ধরাও দিয়েছে। মরি-মরি ক'রে আজও মরা হল না। নব-জীবনের অশ্রুত তানে মর্মবাণী ছন্দে গুঞ্জরিত হতেও চেয়েছে এবং প্রকাশ-পথ খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু 'স্বরগ-সমান' গানের মূর্ছনা লাঞ্ছনার ভয়ে আর কখনও আমার কণ্ঠের ত্রিসীমার মধ্যে আবির্ভূত হতে ভরসা পেল না।

কিন্তু যে কথা বলছিলুম। গানের রাজ্যে নানা রকমের ঢেউ এসে লাগে, বিশেষ ক'রে প্রেমের গানে। অনেক গান গলায়-গলায় ঘোরে, তারপর একদিন ঝিমিয়ে পড়ে মিলিয়ে যায়। আবার ওরই মধ্যে দু-চারটি গান দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও টিঁকে থাকে। সব জিনিসেই চলতি ধুয়ো আমরা মেনে চলি। জামা-কাপড়-গহনার মতই বই আর গানের জগতে অনেক ফ্যাশন এল আর গেল। এক-একটা যুগের মানসিক ঢং-এর সঙ্গে গানের ঢং যেন তাল রেখে চলে। যখন অচল হয়ে ওঠে নতুন কালের নতুন রীতির প্রবর্তনে, সুরকার এবং রচয়িতার স্মৃতিও তখন ধীরে-ধীরে তলিয়ে যায়। দশ পনেরো বছর আগে, শচীন্দ্র দেববর্মণ যে সব প্রেমের গান যে বিশিষ্ট ঢং দিয়ে গাইতেন অথবা পঙ্কজ মল্লিক তাঁর ভরাট জোয়ারী গলায় যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতেন, তাদের স্মৃতিটা আজকাল ফিকে হয়ে আসছে। কিংবা হিমাংশু দত্ত যখন 'আজি অজানারই লাগি,' 'দূর কাননের মুকুল তুমি গো' 'নিতি রাতে কে ডাকে আমায়' প্রভৃতি গানে তাঁর সম্পূর্ণ-নিজস্ব পদ্ধতিতে সুর দিয়ে গান করতেন, তখন গুণগ্রাহী সমালোচক এবং শ্রোতা সুরদানের নিপুণ চমৎকারিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না।

কিন্তু ইতিমধ্যেই এ সব সুরকারদের স্মৃতি রীতিমত ঝাপসা হয়ে এসেছে। আধুনিক গাইয়ের দল এঁদের গান কখনও-সখনও গেয়ে থাকেন, কিন্তু মুখবদল হিসেবে। এঁদের গানের বৈশিষ্ট্য ছিল শুধু হেনা আর মাধবী, চাঁদ আর চামেলির

প্রাচুর্যই নয়, তাদের চেয়ে আরও কিছু বেশি। ভাষা ছিল গীতিপ্রাণ বটে, কিন্তু কণ্ঠে ছিল স্বরবৈচিত্র্য। সুরজ্ঞান, রাগ-মিশ্রণ এবং মীড়ের কাজেও এঁরা সত্যিই কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। এঁদের পরবর্তীকালে অর্থাৎ সাম্প্রতিক যুগে যে সমস্ত প্রেমের গানের রেওয়াজ চলেছে, তাদের কথা পরে বলব। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, তাদের জগা-খিচুড়ি সুরের বাহার বুঝতে পারি বা না পারি, তাদের বাক্-সর্বস্ব বক্তব্যটা ধরবার চেষ্টা ক'রে মোদ্দা কথা বুঝে নিয়েছি যে, এই সব গানের কল্পিত প্রেমিকদল সত্যিই প্রেম করতে শিখেছেন বটে। মানে—সুরের আবেদন মর্মস্পর্শী না হলেও একটানা ঘুমপাড়ানী। আর কথার আবেদন সাংঘাতিকভাবেই আকৃতিময়। এদের পাশে 'মায়ার খেলার হৃদয় কোথায় হারিয়েছি' মনে হয় অস্পষ্ট নীহারিকা। হৃদয় অবশ্য থাকলেই হারাবে চিরকাল। কিন্তু এত বহুবার ধমক দিয়ে হারায় ও গমক দিয়ে ভাঙে আবার জোড়া দিয়ে কাজে চালানো হয় যে, তাকে ভানুমতীর খেলই বলা ভালো। আধুনিক প্রেম-সঙ্গীতের কামনাগুলো বেশ জোরালো। নানা ভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে একই কথা বলা হলেও তার প্রকাশটা সেই অনুপাতে রীতিমত অকুণ্ঠ। ঘণ্টাখানেক আধুনিক গীত শুনলে মনে হবে, প্রেম-গোপিনীর সংখ্যা ষাট হাজারেও ঠিক শানাচ্ছে না।

যে কোনও যুগে যে কোনও প্রেমের গানের মূলতত্ত্ব অবশ্য একই। যেটুকু পার্থক্য, সেটুকু কেবল ভাবনায় ও প্রকাশ ভঙ্গীতে। রূপক-প্রতীকের প্রয়োগে, 'কন্সীট'র ব্যবহারে

যা কিছু তফাৎ। নইলে সেই মান অভিমান, ছলনা মিনতি, মিলন বিরহ, কামনা উচ্ছ্বাস, ভুল-বোঝা কৈফিয়ৎ দেওয়া, কাছে-আসা চলে যাওয়া, হতাশা আর আকুলতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক পর্যায়ের অনুভূতি বা উপলব্ধিগুলিই প্রেমের গানের আদি ও অকৃত্রিম উপকরণ। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শুরু ক'রে গানের রাজা রবীন্দ্রনাথের গীতি-কাব্যে এই সব চিরন্তন অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনগুলি আশ্চর্য ও নিখুঁত-ভাবে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা অল্পেই সারতে হবে, নইলে পুঁথি বেড়ে যায়। বস্তুতঃ ভালোবাসার এমন কোনও কল্পনীয় অবস্থা নেই এবং হতে পারে না যার শিল্পায়িত রূপায়ণ তাঁর গানে ফুটে ওঠেনি। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনি গান লিখেছিলেন বলেই আমরা ভালো-বেসেছি, তাঁর গান শিখেছি বলেই ভালোবাসতে শিখেছি। তাঁর ভাষায় আমরা আজও প্রেম করি, বিচিত্রস্বাদ আকুলতার মর্মগ্রহণ করি আর নারী ও পুরুষ উভয়েই ভালোবাসার কাব্য-সুধায় অবগাহন ক'রে দিব্যদৃষ্টি লাভ করি—স্নিগ্ধাভিষিক্ত হই। প্রণয়ের অন্তর্নিহিত মাধুর্য এবং দৃঢ়তা, তার সরলতা ও জটিলতা, তার স্বচ্ছতা আর কুহেলিকা, তার অপরূপ বৈচিত্র্য এবং কল্পনা তাঁর গানে যতখানি ধরা দিয়েছে, বিশ্বের কোনও কবি ও সুরকারের লেখনীছন্দে ততখানি ধরা পড়েছে কিনা জানি না, অন্ততঃ শোনা যায় নি। কিন্তু কোনও গানই তাঁর বাণীর নিরাভরণ অকুণ্ঠ কামনার অসঙ্কোচ প্রকাশ বহন ক'রে আনে নি। সব গানই যেন নেমে এসেছে পরিচ্ছন্ন অনাবিল মন্দাকিনী-

ধারায়,—প্রবাহিত হয়েছে ভাবান্তরিত অন্তঃশীল হৃদয়স্রোতের ইঙ্গিতময় বাহন হয়ে। তাঁর গানের যাদু এইখানেই। যেটুকু বলা যায়, তার চেয়ে না বলাই থেকে যায় বেশি। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভালোবাসার গানে এমন একটি প্রশান্তি, গাম্ভীর্য এবং বেদনার রেশ থেকে যায়—যার পরে কথা নীরব, মন্তব্য অর্থহীন ধৃষ্টতা। ভাব ও ভাষার সার্থক ও অঙ্গাঙ্গি মিলনে ভালোবাসার একটি বিশেষ দিক জানিয়ে দেবার শান্তমধুর ব্যগ্রতার পূর্ণাঙ্গ ছবি চোখের সামনে তুলে ধরে। এর প্রধান কারণ—কবির স্বকীয় দৃষ্টি-উন্মেষ, প্রেমদর্শনের স্বতন্ত্র মৌলিকতা। ভালোবাসার তত্ত্বে ও প্রকাশে পাওয়াটাই তার কাছে শেষ কথা নয়। না পাওয়া এবং চাওয়ার মধ্য দিয়ে যে আকর্ষণ দুস্তর এবং মহৎ হয়ে ওঠে, সেইটাই বড় কথা।

সকল যুগের সকল মানুষই ভালোবেসেছে এবং সেই ভালোবাসার ব্যাকুল 'তিয়াসা' অথবা 'পিয়াসা' শূন্য 'হৃদয় আসনে' বসিয়ে, অনুরাগটুকু রাগিণীর সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছে। যাবতীয় প্রেমসঙ্গীতের ভঙ্গীই হইল নিবেদন—মিষ্ট তিরস্কার আর ধৃষ্ট প্রণয়ের চাটুবাক্য। এত বছর ধরে মানুষ চেঁচিয়ে মবল 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'! তাতে যতীন্দ্রমোহন সিংহের উপন্যাসে চারুলতার আদর্শনিষ্ঠা বজায় থাকলেও আধুনিকা নায়িকাদের মন সত্যিই ভেজে কিনা সেটা তর্ক-সাপেক্ষ। দু'চারটি সরলা অবলাকে হয়তো এখনও উচ্চাঙ্গের ধাপ্পাবাজিতে মুগ্ধ করা যেতে পারে। সাংসারিক

অন্যমনস্কতায় নিমগ্না বিধুমুখীকে নিবেট উপহারে আর ফাঁকা কথার ষোড়শোপচারে হয়তো বেশ কিছুদিন ভুলিয়ে রেখে বাইবের 'স্পিরিচ্যুয়াল' সঙ্গ-সাধনার ভেল্‌কি জমানো যায়। কিন্তু 'সেট্রন' কতখানি ভেবে দেখুন! নিরন্তর দুর্ভাবনায় রক্তচাপের সম্ভাবনা। আধুনিক নায়করা সে তত্ত্ব করায়ত্ত করেছে বলেই অত অনুনয়-কাকুতির ধার ধারে না। তারা বুঝে নিয়েছে—এত লুকোচাপা ক'রে সামান্য একটি ছারপোকা মারায় কৃতিত্ব নেই, অপৌরুষ আছে। তার চেয়ে মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার!

বর্তমান যুগের কোনও নায়িকার কর্ণকুহরে যদি কোনও উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক 'জীবনে-মরণে শয়নে-স্বপনে তোমারে কেন গো পাই না' বলে তারস্বরে চীৎকার করেন, তা হলে নায়িকার কি মনোভাব হয়—ভাবলেও কষ্ট হয়। কিংবা নবনীড় রচনা ক'রে প্রণয়ী যদি ক্রমাগত 'শোনো গো, শোনো গো' রেকর্ডের 'রীল্যে' চালিয়ে যান, পল্লী মহিলাদের কি মনোবেদনা হয়, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু পাডার লোক চাঁদা ক'রে যদি গালাগাল দিতে শুরু করে, তাহ'লে বোধহয় নিতান্ত অন্যায় হবে না। অথবা কল্পনা করুন—আলু-পটল, মাছ-দুধের ভয়াবহ হিসেব-নিকেশে মেদবহুল গৃহিণী যখন নির্মল শরতের পচা গুমোটে গলদঘর্ম, তখন যদি কোনও চটুল গৃহ-কর্তা তাঁকে খুঁজে হয়রান হয়ে অবশেষে ভাঁড়ার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখা মাত্র চপলকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন 'ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি, কোথা চলে যাও বল না!' তখন

একমাত্র সঙ্গত জবাব হচ্ছে, 'কোথায় আবার, চুলোয়। ন্যাকামি শুনলে গা জ্বলে যায়……'

একবার ছোট বেলায় মফঃস্বলে মহকুমার ছোট এক শহরে যাত্রা শুনেছিলুম। জরির পোষাকে এবং বেপরোয়া তলোয়ার চালনায় যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু ওরই মধ্যে রাজা যখন পার্শ্ববর্তিনী রাণীকে সম্বোধন ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন শ্রোতাদের উদ্দেশে সহসা ভাঙ্গা গলায় আর্তনাদ ক'রে বললেন, 'প্রেয়সি! তোমাকে একটা কথা কানে কানে বলি', আর তারপরই বিনা নোটিশে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন 'ও মুখচন্দ্রমা হেরি'……' তখন নিতান্ত নাবালক হলেও ঐ রকম সনির্ঘোষ প্রেমনিবেদনের ভঙ্গিমা কেমন যেন অশোভন লেগেছিল। আবার কতকাল পরে চিত্রমন্দিরে এ-কালিনী নায়িকাকে দেখলুম বাগানে ঘুরছেন—কারণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে এক পসচ্যরে গান গাওয়া রীতি বিরুদ্ধ। ঘুরছেন—আর ফুলের স্তবকে গাল ঠেকিয়ে নানাবিধ ভ্রূভঙ্গী সহকারে স্কন্ধ বাহু ও কোমর যুগপৎ লীলায়িত ক'রে হয়তো গাইছেন 'এই বাগানের ফুলটি আমি, দেখছ তুমি কি!' দু'টি দৃশ্যই স্মরণ ক'রে সারমর্ম বুঝেছি—প্রেমের গানে কথা বা ছবিরই শুধু বদল হয়েছে। নইলে ভাবের ও ভাষার আড়ালে মর্মান্তিকতা কিছুমাত্র কমে নি।

তিরিশ চল্লিশ বছর আগে যখন পাড়ায় পাড়ায় কনসার্ট বাজনা আর থিয়েটারের রিহার্শেল চলত, তখন প্রেমসঙ্গীতের যে সব নমুনা গলার শির ফুলিয়ে বুক ফাটানো দম দিয়ে গাওয়া

হত, তা মনে করলেও এখন হাসি পায়। কিন্তু সে কথা যাক্। তখনকার দিনে বিশ-বাইশ বছরের ছোক্‌রা গলায় মালা আর মাথায় টোপর দেবার আগে অন্তত বন্ধুদের কাছ থেকে দু' একখানি শেখা গান ভেঁজে তৈরী ক'রে রাখত, যেমন 'হৃদয় আসন রেখেছি পাতিয়া' কিংবা নিদেন পক্ষে 'কারে মজাইতে আজি এ নিশীথে'......। এর কিছু পরে বাসর ঘরের 'ফেভ্যরিট' গান ছিল 'নলিনী খোল আঁখি' এবং 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না মোরে......' এই তো সেদিন আমাদের বিনোদ দা' লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করলেন যে, ১৯১৬ সালে বিয়ের রাতে তিনি অপটু কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন এবং নারীকণ্ঠের গানও শুনেছিলেন। গান দু'টি তাঁর আজও মনে আছে। প্রথমটি—'বাসি হল বনমালা দেখ না লো প্রিয় সই, ধূসর গগনে শশী কালো শশী এলো কই' আর দ্বিতীয়টি—'নীল আকাশে কিরণ হাসে, কি নব আবেশে পরাণ ধায়, ললিত লহরী তুলিয়া সুতানে জোছনা কিরণে মিশাতে চায়।' এ সব গান অবশ্য নিতান্তই সেকেলে, তবু সমাজচিত্র হিসেবে এদের উল্লেখ প্রয়োজন। এদিকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচলন বরাবরই ছিল এবং তাদের মধ্যে গায়কের রুচি ও কণ্ঠ নৈপুণ্যে কয়েকটি গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্য একটি গানের কলি আজও বারবার মনে পড়ে যায়—'আমারে ভালোবেসে আমারই লাগিয়া সয়েছ কত ব্যথা, বেদনা অপমান'—বিশেষ ক'রে ঐ বেদনা অপমানের কাছটায় একটা হৃদয়-মচকানো মোচড়, যেটা অনেক কসরৎ ক'রে বাগিয়ে-

ছিলুম। তখনকার দিনে 'সই' 'সজনি' আর 'সখার' একটু বেশ ছড়াছড়ি ছিল, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গানেও। তাই আজকালকার দিনে শুধু 'প্রিয়' সম্বোধনে অভ্যস্ত মার্জিত প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে সেগুলো তেমন শ্রুতিমধুর ঠেকবে না।

এইবার এমন কয়েকটি প্রেমের গানের উল্লেখ করি যাদের প্রচলন ছিল এককালে খুব বেশি। থিয়েটার সঙ্গীতের কথা বাদ দিলাম। বটতলার প্রকাশিত বইয়ে হয়তো তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে। অন্তত পুরানো রেকর্ড সঙ্গীতের তালিকা যাঁদের বাড়ীতে আছে তাঁরা সময়মত যদি সেগুলো উল্টে দেখেন, তাহ'লে বুঝতে পারবেন কী ধরণের গানের রেওয়াজ কখন এসেছে আবার চলে গেছে। সে কালের আশ্চর্যময়ী, তিনকড়ি, হরিমতী, বেদানা, পান্না থেকে শুরু ক'রে মধ্যযুগের আঙুর-নীহার-ইন্দুবালার গান আবার আধুনিকতম গায়কদের রেকর্ড সঙ্গীত বাংলা দেশের প্রেমজ্বরের তাপমান যন্ত্র। বাল্যকালে তন্ময় হয়ে লালচাঁদ বড়ালের 'অনুগত জনে কেন...' গানটি পাশের বাড়ীর বৌদির গ্রামোফোনে শুনতুম আর ভাবতুম — যদি ভালোবেসে গাইতে হয়, তবে যেন এই রকমটি সমের মাথায় 'আঃ... ছাড়তে পারি। কিন্তু বর্তমান যুগের কোনও নায়ক যদি নায়িকাকে ভালোবাসার গান ঐ ভঙ্গিমায় শোনাতে গিয়ে মাঝখান থেকে লালচাঁদের ঢঙে একটু সা-রি-গ-ম সেধে নেন, তা হলে আধুনিকা সোজাসুজি প্রবঞ্চনা না করুন, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে আঁচল দুলিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন নিশ্চয়ই।

বাল্যস্মৃতিব কথা যাক্। এক সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালেব গান বাজাব গবম ক'বে রেখেছিল। তাঁর গানের পাশে অন্য গান টিম্ টিম্ কবত,—বিশেষ ক'বে 'মলয আসিয়া কয়ে গেছে কানে'। ১৯২২ সালে দিলীপকুমারেব কণ্ঠ হলে তো কথাই নেই, অন্য যে কোনও দবদী সুগায়কেব কণ্ঠে এ গানখানি শোনাব পব 'প্রিয়তম' যে আসিবে, সে বিষয়ে আব বিন্দুমাত্র সংশয় থাকত না।

রুচিশীলতা আর জনপ্রিয়তাব দিক থেকে অতুলপ্রসাদেব গানগুলি একদিন সত্যিই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাব ক'বে ছিল। কথার সরল বিন্যাসে ও আবেদনে, সুবেব কাজে এবং তানের অবসরে অনেক গায়কই একদা অতুলপ্রসাদেব গান নিয়ে আসর মাৎ করেছেন—যেমন হবেন চাটুজ্যে, অম্বিকা, হর্ষদেব ও হবিপদ বায়। ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তাঁব গানগুলি স্ত্রী-পুরুষেব কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরেছে। এখনও যে মধ্যে মধ্যে অতুলপ্রসাদী সঙ্গীতের বিশেষ অধিবেশন হয়, সেটা সেন-মশায়েব গানেব স্বভাব-উৎকর্ষই প্রমাণ কবে। 'আর কতকাল রইব বসে' গানটি দিলীপকুমারের কণ্ঠে আর 'কেন এলে মোব ঘরে' এ গানটি তাঁরই ভাই হেমেন্দ্রলালের কাছে কিংবা সাহানা দেবীর গলায় 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণি, শোনবার সুযোগ যাঁদেব হয়েছে, তাঁবাই বুঝবেন অতুলপ্রসাদেব প্রেমের গানের অবর্ণনীয় মাধুর্য।

বিশ পঁচিশ বছর আগে শিক্ষিত সমাজে আর বাঙলা গানের আসরে, একদিকে যেমন গাওয়া হত, রবীন্দ্রনাথের ও

অতুলপ্রসাদের গান, অথবা 'চিরকুমার সভা'র বিখ্যাত গানগুলি শুনতে পেতুম ঘরে ঘরে, অপরদিকে তেমনি একটা বিশেষ ধাঁচের ভালোবাসার গান উৎসারিত হয়েছিল কয়েকটি গজল সঙ্গীতে। 'কে বিদেশী মন উদাসী' গানটি এক সময়ে এতই জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল যে, শহর থেকে বহু দূরে গেলেও শুনতে হত 'বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে!' এই সময়ে নজরুলসঙ্গীতের সঙ্গে পাল্লা রেখে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েকটি গান কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কণ্ঠমারফৎ বোধ করি সারা বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হয় নি, সজল আক্ষেপে আর বিরহ-ব্যথায় ভাসিয়ে মজিয়ে ছেড়েছিল। 'নয়ন য'দিন রইবে বেঁচে,' ততদিন প্রিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে চোখ প্রায় ট্যারা হবার জোগাড়। 'চোখের জলে মন ভিজিয়ে' উদাসী চলে যাচ্ছে, আর 'ঐ অধরের গোলাপী রং' প্রাণে মাখামাখি হচ্ছে—এই সমস্ত গান একদিন বৌবাজার, পটলডাঙ্গা, শ্যামপুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে যুবকদের পাড়ার বৈঠকে সঙ্গত সহকারে খুবই আবেগের সঙ্গে গাওয়া হতে শুনেছি। 'চরণ ধরে বারণ করি' এই গানটি নিয়ে নেবুতলার এক বারোয়ারী মজলিশে যেমন দাপাদাপি করতে দেখেছি, তেমনটি আর নজরে পড়ল না। মনে হত, 'চোখের টানে' যদি বা প্রেম বঁড়শিগেঁথা হয়ে বেঁচে থাকে, নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় ঐ একঘেয়ে গানের টানে পড়শী-দের পরমায়ু আর বুঝি টেঁকে না। এই সব গানে রঙ আর ভাবপ্রবণতার আতিশয্যই ছিল বেশি। তবু সুরের ঠমকে আর কথার চমকে তারা এক সময়ে ভালবাসা নিয়ে কলকাতার

গলিতে আর ছাদে রীতিমত ছিনিমিনি খেলেছিল।

গত দশ পনেরো বছরে যে সব ধরণের গান চালু হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে কিছু গান ভালো, কিছু মাঝারি, কিছু বা অচল। কোনও কোনও গান কথা ও সুরের সমন্বয়ে চিত্তাকর্ষী। 'কে জানে কেন আমায় সারাক্ষণ ভুলাও তুমি,' 'নিঝুম রাতে……', 'যবে আকাশেতে ছিল চাঁদ', 'এখনি উঠিবে চাঁদ আধো-আলো আধো-ছায়াতে' প্রভৃতি গানগুলিতে আন্তরিকতার সঙ্গে উপ-যোগী সুরের ভালো সংমিশ্রণ আছে। তার প্রধান কারণ অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ প্রমুখ গীতকার ভালো সুর-কারের সহযোগীতা পেয়েছিলেন। তাই কয়েকটি গান জন-প্রিয় হয়েও জাত খোয়ায় নি। হাল আমলে যে সব গান গাওয়া হচ্ছে—বেতার এবং ছায়াচিত্রের মাধ্যমে, সেগুলি কতখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে, তার বিচারের সময় যদি বা এসে থাকে, আমি অন্ততঃ করতে রাজি নই। তবে ভালোবাসার ধরণ যে বদলে গেছে এবং ক্রমশঃ আরও বদলাচ্ছে, সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহের অবকাশ নেই। আগেকার দিনে প্রেমের গানের বৈশিষ্ট্যই ছিল মিষ্ট সঙ্কোচ, এখন এসেছে হুকুমজারি। অনুনয়ের একটা বহিরঙ্গ আছে মাত্র। কিন্তু সেটা পালিস অথবা মুখোস।

বিংশ শতকের ঠিক মধ্যভাগে বাঙালী যুবক-প্রেমিকরা ঠিক কী ধরণের গান করেন বা ভালোবাসেন, তার নমুনা আপ-নারা তো শুনছেন। নিত্যই শুনছেন এবং তরুণীর দল

কিভাবে উতোর গাইছেন, সেটাও আপনাদের অবিদিত নয়। আমি শুধু দেখি, আমাদের আমলের গান ইতিহাসের পর্যায়ে পড়তে চলল। 'ফুটি ফুটি ফোটে না কো'—এ গান করলে এখন মালতী আর কথা রাখে না। 'একটু কেবল বসতে দিও কাছে' বললে পরে আধুনিকা হয় তো ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দেবেন 'আহা! কে মানা করছে!' তাই এখনকার দিনে শুনি নতুন ধরণের গান, কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি ভালোবাসার নতুনতর প্রণালী। 'কথা কয়ো না, শুধু শোনো' বললে চটুলা প্রেমিকা যে মুখ বুজে শুধু শুনেই যাবেন—এটা কল্পনার অতীত। তবে তন্ময় আত্মতৃপ্তিতে নিশ্চয়ই আর নিছক চাটু-বাক্যে তিনি ভুলবেন না—যদি নায়ক বলেন, 'আমার বিরহ-আকাশে প্রিয়া এক ফোঁটা তুমি জল'! কবিতার ছবি হিসেবে এটি সত্যিই অনবদ্য-সুন্দর। বিরহ-আগুনে খাঁ-খাঁ করছে মাটি আর বাতাস। তামাটে পোড়া আকাশে শুধু এক ফোঁটা জল টল-টল করছে অথচ পড়ছে না—যেমনটি দেখা যায় ক্লোজ-আপ ছবিতে চিত্রতারকার সুর্মাটানা নয়নপল্লবে! দৃশ্যটি হয়তো খুবই মনোরম। আমরা সকলেই উপভোগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই ফোঁটাটুকু মুছে যেতে কতক্ষণ! আর দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ঘনালে আরও কত ফোঁটা এসে জুটবে অথবা বুকে ঝরে পড়বে, জোর ক'রে কিছুই বলা চলে না। নায়ক যদি বাহির বিশ্বের ব্যাকুল আহ্বানে গেয়ে ওঠেন 'পৃথিবী আমারে চায়'—যেমন অনবরত তিনি গেয়ে চলেছেন গত তিন চার বছর ধরে সর্বজনীন মণ্ডপে ভাড়াটে লাউড স্পীকারে—

আধুনিকা তখন কি করবেন ? বুদ্ধিমতী হলে বলবেন 'কে আটকাচ্ছে ?' নাছোড়বান্দা নায়িকার নাগপাশ বন্ধন এখন শিথিল হয়ে আসছে। তবু নায়ক শেষের আশা ছাড়তে পারেন না, বলেন 'হয় ফিরে যাও, নয় সাথে চলো……'। তালে ঠিক আছে।

আমাদের যুগের স্বপক্ষে শুধু একটি কথা বলে রাখি। আজকালকার প্রেমের গানে যে বলিষ্ঠতার দাবী করা হয়, সেটা কি সত্যিকারের সাহস না পোজ্ ? আমার তো মনে হয়, ওতে কিছুমাত্র দুঃসাহসিকতার পরিচয় নেই। এখন তো ট্রামে-বাসে, লেকে-সিনেমায়, পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে-বসে প্রেম করা চলে ও প্রেমের গান গাওয়া যায়। কিন্তু ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে সহপাঠিনীর সঙ্গে একট্রামে হঠাৎ দেখা হলে অথবা একত্র দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে হৃদয়ে যে ধাক্কা লাগত এবং সে ধাক্কা সামলে উঠে লোকসমাজে চলাফেরা করতে হত, তাতে সাহসের প্রয়োজন ছিল বেশি। প্রতিবেশিনীকে একখানি চিঠি দেওয়া কিংবা বটানিক্যাল গার্ডেনে একত্র বনভোজনে যাওয়া নিয়ে সে যুগে একখানা পুরো অষ্টাধ্যায়ী উপন্যাস রচনা করা চল্‌ত অনায়াসে। এখন তা নিয়ে একটা ছোট গল্পও জমানো যায় না। সমাজ আর শাসনের বন্ধন যখন আল্‌গা এবং লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, তখন অঙ্গুষ্ঠ দেখানোয় এমন কি কৃতিত্ব ?

যাক্ সে কথা। এখন অনাগত দিনের প্রেমের গান কি ভাষায় লেখা ও গাওয়া হবে, ভরসা ক'রে ভবিষ্যৎ বাণী করা

চলে না। হয়তো 'জোর ক'রে কেড়ে নেব', 'চুলের মুঠি ধরে টান্‌ব' এমনি কোনও আদিম সুরে ও ভাষায় গান রচিত হবে। ক্ষতি কি? ভালোবাসার রূপ ও প্রকাশ বদ্‌লে গেলেও গান মরবে না বাঙলা দেশের মাটিতে। প্রেমপূজা সাঙ্গ ক'রে প্রতিমাখানা আদি রসের ভাঁটিগঙ্গায় ভাসান দিলেও বিসর্জনীর ধার-করা ঢাক-ঢোল এবং জগঝম্প সহজে বন্ধ হচ্ছে না। আগমনীর সানাই হয়তো আর শোনা যায় না। কিন্তু বোম্বাই-মার্কা বাদ্য-সহযোগে, পেশোয়াজ-ওড়নাধারিণীর মোহিনী মূর্তি গাইতে থাকেন, 'আয়েগা···আয়েগা' কিংবা কটাক্ষ-কারিণীর মদালসকণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'মেরি রাজা—

'তু আ-যা আ-যা আ-যা······